لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৪ তম বর্ষ ।। ১৯শ সংখ্যা

২৩শে শাওয়াল, ১৪১৩ হিঃ ।। ২রা বৈশাখ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ ।। ১৫ই এপ্রিল, ১৯৯৩ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ১৯শ সংখ্যা (৫ঃতম বর্ষ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ তাক্‌ওয়া (খোদা-ভীরুতা) ৩

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদ : জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৪

জুমুআর খুত্‌বা
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)
অনুবাদ : জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৯

২৩শে মার্চের পোড়ার কথা
আলহাজ্জ এ, টি, চৌধুরী ২৭

ধর্মান্ধতা ঃ একুশের চেতনায়
জনাব জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ৩০

কেন আহ্‌মদী হলেম
জনাব সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী ৩৩

সংবাদ ৩৭

সম্পাদকীয় ৪১

অতীব শান ও শওকতের সাথে দেশের বিভিন্ন জামাতে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত

১৮৮৯ সনের ২৩শে মার্চ্চ চল্লিশ জন পুণ্যাত্মা ব্যক্তির এক অনাড়ম্বর বয়াত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শুভ অগ্রযাত্রা শুরু হয়। আর এ বয়াত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। এ দিনকে স্মরণীয় রাখার জন্যে প্রতি বছর 'মসীহ মাওউদ দিবস' পালন করা হয় দিবসের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা-বৈঠকের মাধ্যমে। এ বছরও দেশের বিভিন্ন জামাতে অতীব শান ও শওকতের সাথে এ দিবসটি পালিত হয়। এ পর্যন্ত যেসব জামাত ও সংগঠন থেকে 'মসীহ মাওউদ দিবস' পালনের খবর পাওয়া গেছে তারা হলেন : নাসেরাবাদ, পুরুলিয়া, কুমিল্লা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া-ঢাকা, শাহবাজপুর, বগুড়া, গালিমগাজী, ক্রোড়া, সুন্দরবন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঘাটুরা, কটিয়াদী, জামালপুর (হবিগঞ্জ), চান্দপুর চা বাগান ও নারায়ণগঞ্জ।

আহমদী বার্তা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৪তম বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা

১৫ই এপ্রিল, ১৯৯৩ : ১৫ই শাহাদাত, ১৩৭২ হিঃ শামসী : ২রা বৈশাখ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

সূরা আল্‌ বাকারা—২

২৬৩। যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে, অতঃপর, তাহারা যাহা খরচ করে উহার সম্বন্ধে পিছনে খোঁটা দিয়া ও কষ্ট (৩৩১) দিয়া বেড়ায় না; তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর সন্নিধানে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে; তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

২৬৪। ন্যায়সংগত কথা এবং ক্ষমা (৩৩২) সেই দান হইতে উত্তম যাহার পরে কষ্ট-ক্লেশ আরম্ভ হইয়া যায়। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ স্বয়ংসম্পূর্ণ-ঐশ্বর্যশালী, পরম সহিষ্ণু।

৩৩১। প্রত্যেক ভাল কাজেরই মন্দ ব্যবহারও আছে। আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার মন্দ দিক হইল, খরচের পরে গর্বের সহিত ইহা ফলাও করিয়া প্রচার করা (যাহাকে বলা হয় "মান্ন্‌") অথবা (দানের) পরে, গ্রহীতার প্রতি দুর্ব্যবহার করা, (যাহাকে বলা হয় "আযা")। যাহারা প্রকৃতই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ধন-দৌলত খরচ করেন, তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে তাহারা যেন অহেতুক, অনর্থক খরচের কথা উল্লেখ না করেন। সত্যের পথে তাহারা যে খেদমত পেশ করেন, তাহার প্রচারও বিনা কারণে নিষিদ্ধ। এইরূপ করাকে "মান্ন্‌" বলা হয়, যাহার অর্থ অনুগ্রহের খোঁটা দেওয়া। অনুরূপভাবে দান-খয়রাতের পরিবর্তে, আল্লাহ্‌র কাছে ছাড়া অন্যের কাছে কোনও রকমের পারিতোষিক লাভের চিন্তা করাও নিষেধ।

৩৩২। সাহায্য প্রার্থীকে সাহায্য করিয়া পরে তাহাকে কোন কটু কথা শুনানোর চাইতে তাহাকে, সহানুভূতিসূচক দুই-চার কথা বলা এবং অপারগতা-নির্দেশক ক্ষমা চাওয়া বরং শ্রেয়ঃ। অথবা, সাহায্য প্রার্থীর অভাব-অনটনকে অন্যের কাছে অনর্থক বলাবলি করিয়া তাহাকে হেয় ও খাঁট করার চাইতে, তাহা ঢাকিয়া গোপন রাখা বরং ভালো। ইহাও মাগফিরাতের তাৎপর্য।

২৬৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা দানের খোঁটা দিয়া এবং কষ্ট দিয়া নিজেদের দানসমূহকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় ব্যর্থ করিও না যে নিজের ধন-সম্পদ লোক (৩৬৩) দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং সে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না। অতএব তাহার উপমা ঐ মসৃণ-শক্ত প্রস্তরের অবস্থার ন্যায়, যাহার উপর অল্প মাটি পড়িয়া আছে, অতঃপর, উহার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হয় এবং উহাকে পরিষ্কার শক্ত প্রস্তররূপেই রাখিয়া যায়। তাহারা যাহা কিছু উপার্জন করে উহার কোন অংশই তাহারা রক্ষা করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে কাফের জাতিকে আল্লাহ্ হেদায়াত দেন না।

২৬৬। এবং যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং তাহাদের আত্মার দৃঢ়তার (৩৬৪) জন্য খরচ করে তাহাদের দৃষ্টিতে উচ্চস্থানে (৩৬৫) অবস্থিত সেই বাগানের অবস্থার ন্যায় যাহার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হইলে পরে উহা দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে। আর যদি উহাতে প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয় তাহা হইলে অল্প বৃষ্টিই যথেষ্ট এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।

৩৬৩। অন্যত্র কুরআনে, প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করার জন্যও মুসলমানকে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য শুধু এতটুকুই যে, অন্যেরাও যেন উৎসাহিত হইয়া তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এবং নিজেরা দান-খয়রাতে ব্রতী হয়। কিন্তু যাহারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে না, তাহারা কেবল জনগণের প্রশংসা অর্জনের উদ্দেশ্যেই দেখাইয়া দেখাইয়া, ঘটা করিয়া দান খয়রাত করিয়া থাকে। তাহারা আল্লাহ্র কাছ হইতে পুরস্কার প্রাপ্তির সুযোগ ও যোগ্যতা হারাইয়া ফেলে।

৩৬৪। আল্লাহ্র রাস্তায় যাহারা খরচ করেন, তাহাদের আত্মার শক্তি বৃদ্ধি পায়, কারণ তাহাদের কষ্টার্জিত অর্থ ও ধন আল্লাহ্র পথে দান করিয়া তাহারা নিজেদের উপরে স্বেচ্ছাকৃতভাবে যে বোঝা আরোপ করেন, তাহা বহন করিবার শক্তি লাভ করিয়া তাহারা শক্তিমান হইয়া উঠেন এবং তাহাদের ঈমানে দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়।

৩৬৫। মুক্ত হস্তে আল্লাহ্র পথে দান করার ফলে মু'মেনের হৃদয় উচ্চ ও ফলনশীল ভূমিখণ্ডের মত হইয়া যায়, যাহা অতিবৃষ্টিতেও ডুবে না এবং অল্পবৃষ্টিতেও ভাল ফসল প্রদান করে।

হাদিস শরীফ

তাক্ওয়া (খোদা-ভীরুতা)

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

কুরআন শরীফ :

ان اكرمكم عندالله اتقكم (الحجرات : ١٣)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী (আল-হুজুরাত : ১৪)।

হাদীস শরীফ :

عن زيد بن ارقم .....اللهم ات نفسى تقوا ها وزكها انت خير من زكها انت وليها و مولاها (مسلم)

অর্থাৎ হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর এই দোয়া বর্ণনা করছেন যে, হে খোদা তুমি আমার আত্মাকে তাকওয়া দান কর, ইহাকে (আত্মাকে) পবিত্র কর, তুমি পবিত্রকারীদের মধ্য হতে সর্বোত্তম, তুমিই ইহার (আত্মার) বন্ধু ও অভিভাবক (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসে হুযুর (সাঃ) আমাদিগকে আধ্যাত্মিক জীবন অর্জনের লক্ষ্যে মূল দোয়া শিখিয়েছেন। এ দুনিয়াতে প্রতিটি বস্তু কোন না কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনও তাই তাকওয়ার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে আল্লাহ্‌তা'লা জানিয়েছেন।

ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے
گر یہ جڑ رہی تو سب کچھ رہا ہے

অর্থাৎ প্রত্যেক পুণ্যের মূল তাক্ওয়া। যদি প্রতিটি কর্মের মূলে এই তাক্ওয়া থাকে তাহলে সফলতা পাবে। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, আমার দৃষ্টিতে সম্মানিত হবার মাপ কাঠি হলো তাকওয়া।

সফলতা লাভের জন্যে তাক্ওয়া লাভ করা অত্যাবশ্যকীয়। তাক্ওয়া কি? তাক্ওয়া হলো সর্বদা নিজের প্রতিটি কর্মের প্রতি এভাবে দৃষ্টি রাখা যেন কোন কর্মে খোদাতা'লা অসন্তুষ্ট না হন। ইহাই হলো তাক্ওয়ার প্রকৃত অর্থ। তাক্ওয়া বা খোদা-ভীতির অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে তার থেকে দূরে সরে যাওয়া বরং এর অর্থ হবে খোদার অসন্তুষ্টির ভয়কে সর্বদা নিজের দৃষ্টিতে রাখা।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাক্ওয়ার সর্বোচ্চ মার্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন তথাপি তিনিও তাক্ওয়া লাভের জন্যে দোয়া করে গিয়েছেন এবং তাঁর উম্মতকেও তা শিখিয়েছেন।

আজ দুনিয়াতে যে অশান্তি বিরাজমান এর মূল কারণ হলো তাক্ওয়ার অভাব। তাই আসুন আমরা খোদার নিকট এই প্রার্থনা করি 'হে খোদা! তুমি আমাদিগকে তাক্ওয়া দান কর এবং দুনিয়াবাসীকেও তোমার তাকওয়া প্রদানের মাধ্যমে শান্তি দাও। আমীন।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভুঁইয়া

(১৭ ও ১৮শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তৃতীয় শ্রেণীর লোকদের স্বপ্ন অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয় এবং তাহাদের সকল ভবিষ্যদ্বাণী সব চাইতে সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এতদ্ব্যতীত এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী আজিমুশ্বান বিষয় সম্পর্কে হয় এবং এইগুলি এত বিপুল সংখ্যায় হয় যেন ইহারা একটি সমুদ্র। তদ্রূপেই এইগুলির তত্ত্বজ্ঞান ও যথার্থতাও বৈশিষ্টা ও সংখ্যার দিক হইতে সর্বাধিক। খোদার বাণী সম্পর্কে এই তত্ত্বজ্ঞান সঠিক বলিয়া সাব্যস্ত হয়, যাহা অন্যদের বেলায় হয় না। কেন-না তাহারা 'রূহুল কুদুস' (পবিত্র আত্মা)-এর নিকট হইতে সাহায্য লাভ করেন। যেভাবে তাহাদিগকে জীবন্ত হৃদয় দান করা হয়, সেভাবেই তাহাদিগকে একটি ভাষা দেওয়া হয়। তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান বর্তমানের ঝরণা হইতে নির্গত হয়, মানব প্রকৃতির সকল উৎকৃষ্ট শাখা তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহারই মোকাবেলায় সকল প্রকারের সাহায্যও তাহাদিগকে প্রদান করা হয়। তাহাদের বক্ষকে খুলিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে খোদার পথে এক অসাধারণ বীরত্ব প্রদান করা হয়। তাহারা খোদার জন্য মৃত্যুকে ভয় করে না এবং আগুনে দগ্ধ হইবে বলিয়া ভীত হয় না। তাহাদের দুগ্ধে পৃথিবী প্লাবিত হয় এবং দুর্বলচিত্ত লোকেরা শক্তি লাভ করে। খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাহাদের হৃদয় উৎসর্গীকৃত। তাহারা তাঁহারই হইয়া যান। এই জন্যই খোদা তাহাদের হইয়া যান। যখন তাহারা পূর্ণ হৃদয়ে খোদার দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন তখন খোদা অনুরূপভাবেই তাহাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। তখন সকলেই অবহিত হয় যে, সকল ক্ষেত্রে খোদা তাহাদের সমর্থন দেন। প্রকৃতপক্ষে খোদার লোকগণকে কেহ সনাক্ত করিতে পারে না। কেবল তাহারাই সনাক্ত করিতে পারে যাহাদের হৃদয়ের উপর সর্বশক্তিমান খোদার দৃষ্টি পড়ে এবং যাহাদিগকে তিনি দেখেন যে, সত্য সত্যই তাহারা তাঁহার দিকে আসিয়াছে। খোদা তাহাদের জন্য অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করিয়া থাকেন এবং তাহাদের সাহায্যের জন্য প্রত্যেক পথে দণ্ডায়মান হন। তিনি তাহাদের জন্য ঐ সকল শক্তির মহিমা দেখান, যাহা জগতে গুপ্ত। তিনি তাহাদের জন্য এইরূপ আত্মাভিমানী হইয়া পড়েন যে, কোন মানুষ আপন মানুষের জন্য এইরূপ আত্মাভিমান দেখাইতে পারে না। তিনি স্বীয় জ্ঞান হইতে তাহাদিগকে জ্ঞান দান করেন এবং স্বীয় প্রজ্ঞা হইতে তহোদিগকে প্রজ্ঞা দান করেন। তিনি

তাহাদিগকে নিজের জন্য এইরূপ মগ্ন করিয়া দেন যে, অন্য সকল লোকের তুলনায় তাহাদের সম্পর্ক নিশ্চিত হইয়া যায়। এইরূপ লোকেরা খোদার প্রেমে মৃত্যু বরণ করিয়া এক নতুন জন্ম লাভ করে এবং উহাতে বিলীন হইয়া এক নূতন সত্তার উত্তরাধিকারীতে পরিণত হয়। খোদা তাহাদিগকে অন্যদের দৃষ্টি হইতে এইরূপেই গোপন রাখেন যেন তাহারা নিজেরাই গুপ্ত। কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও তিনি স্বীয় চেহারার ঝলক তাহাদের মুখের উপর প্রতিফলিত করেন এবং স্বীয় জ্যোতিঃ তাহাদের কপালে বিকিরণ করেন। ইহার দরুন তাহারা গুপ্ত থাকিতে পারে না। যখন তাহাদের উপর কোন বিপদ আসে তখন তাহারা পিছনে হটে না, বরং সম্মুখে কদম বাড়ায় এবং তাহাদের আজিকার দিন গতকালের তুলনায় তত্ত্বজ্ঞানে ও ভালবাসায় অধিক ভরপুর হইয়া উঠে। প্রতি মুহূর্তে তাহাদের উন্নতিতে ভালবাসার সম্পর্ক শামেল থাকে। তাহাদের ভালবাসার প্রচণ্ডতা, নির্ভরশীলতা ও 'তাকওয়ার' (খোদা-ভীরুতার) দরুন তাহাদের দোয়া রদ করা হয় না এবং তাহাদিগকে বিনষ্টও করা হয় না। কেন-না তাহারা খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিমগ্ন থাকেন এবং নিজেদের সন্তুষ্টি বিসর্জন দেন। এইজন্য খোদাও তাহাদেরকে সন্তুষ্ট করেন। তাহারা অনেক পর্দার অন্তরালে থাকেন। জগদ্বাসী তাহাদিগকে সনাক্ত করিতে পারে না। তাহারা দুনিয়া হইতে অনেক দূরে চলিয়া যান। তাহাদের সম্পর্কে যাহারা বাহ্যিক রায় প্রদান করে তাহারা ধ্বংস হইয়া যায়। বন্ধু বা দুশমন—কেহই তাহাদের প্রকৃত অবস্থানস্থল পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। কেন-না তাহারা খোদার চাদরের মধ্যে লুক্কায়িত থাকেন। কে তাহাদের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়? কেবল ঐ সকল ব্যক্তিই জ্ঞাত হয়, যাহাদের ভালবাসার আবেগে তাহারা মগ্ন হন। তাহারা একটি সম্প্রদায়, যাহারা খোদা নহেন কিন্তু খোদা হইতে একটুও পৃথক নহেন। তাহারা সকলের চাইতে খোদাকে অধিক ভয় করেন। তাহারা সকলের চাইতে খোদার প্রতি অধিক বিশ্বস্ত। তাহারা সকলের চাইতে খোদার পথে অধিক সত্যবাদিতা ও দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করেন। তাহারা সকলের চাইতে খোদার উপর অধিক নির্ভর করেন। তাহারা সকলের চাইতে খোদার সন্তুষ্টি অধিক অন্বেষণ করেন। তাহারা সকলের চাইতে অধিক খোদার সঙ্গে থাকেন। তাহারা সকলের চাইতে অধিক নিজেদের প্রিয় প্রভুকে ভালবাসেন। খোদার সহিত সম্পর্ক স্থাপনে তাহাদের কদম ঐ স্থান পর্যন্ত যায়, যেখানে মানুষের দৃষ্টি পৌঁছিতে পারে না। এই জন্য খোদা এইরূপ অসাধারণ সাহায্যসহ তাহাদের দিকে দৌঁড়াইয়া আসেন, যেমন তিনি অন্য এক খোদা এবং তাহাদের জন্য ঐ কাজ করিয়া দেখান যাহা পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে অন্য কাহারো জন্য তিনি দেখান না।

চতুর্থ অধ্যায়

(আমার নিজের অবস্থা বর্ণনায়, অর্থাৎ এই বিষয়ের বর্ণনায় যে খোদাতা'লার আশিস ও কৃপা আমাকে ঐ তিন স্তরের মধ্যে কোন্ স্তরে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন)।

খোদাতা'লা ইহা জানেন এবং তিনি সকল বিষয়ে উত্তম সাক্ষী যে, ঐ বস্তু, যাহা তাঁহার পথে আমাকে সর্বাগ্রে দেওয়া হইয়াছে তাহা ছিল সুন্দর অন্তর। অর্থাৎ এইরূপ অন্তর যাহার প্রকৃত সম্পর্ক মহা সম্মানিত ও মহাপরাক্রমশালী খোদা ব্যতিত অন্য কোন বস্তুর সহিত ছিল না। কোন এক সময়ে আমি যুবক ছিলাম। এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু আমি আমার জীবনের কোন অংশে মহা সম্মানিত ও মহাপরাক্রমশালী খোদা ছাড়া অন্য কাহারো সহিত নিজের প্রকৃত সম্পর্ক খুঁজিয়া পাই নাই। মৌলভী রুমী সাহেব যেন আমার জন্যই এই দুইটি কবিতার পঙতি রচনা করিয়া ছিলেন :—

من زهر جمعیتے نالان شدم   جفت خوشحالان وبدحالاں وشدم
هر کسے از ظن خود شدیار من   واز درون من نجست اسرار من

(অর্থঃ আমি আমার জীবনের ভালমন্দ সর্বাবস্থায় শান্তিপূর্ণ হইয়াও সদা ক্রন্দনরত থাকিয়া অতি নম্রভাবে জীবন যাপন করিয়াছি। প্রত্যেকেই অতি সরল চিত্তে আমাকে বন্ধুভাবে সম্মান করিতেন! (কিন্তু) তবুও আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে, কিরূপ রূহানী রহস্যে আমি অনুপ্রাণিত ছিলাম, কেহই উহার অনুসন্ধান করে নাই। (অনুবাদক)।

যদিও খোদা আমাকে কিছু কম দেন নাই এবং প্রত্যেক কল্যাণ ও আরাম এতখানি দান করিয়াছেন যে, এইগুলির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মত শক্তি আমার অন্তর ও ভাষার কখনো নাই, তথাপি তিনি আমার প্রকৃতিকে এইরূপে তৈরার করিয়াছেন যে, আমি পৃথিবীর নশ্বর বস্তু হইতে সর্বদা অনাসক্ত রহিয়াছি। ঐ যুগেও যখন আমি এই পৃথিবীতে এক নুতন মুসাফির ছিলাম এবং সবে মাত্র সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি তখনও আমি ভালবাসার এই উত্তাপ হইতে রিক্ত ছিলাম না, যাহা মহাসম্মানিত ও মহাপরাক্রমশালী খোদার সহিত থাকা উচিত। এই ভালবাসার উত্তাপের দরুনই আমি কখনো এইরূপ কোন ধর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হই নাই, যাহার আকিদা বিশ্বাসসমূহ খোদাতা'লার মর্যাদা ও একত্বের পরিপন্থী বা কোন প্রকারের অবমাননার সহিত সম্পৃক্ত! এই কারণেই খৃষ্ট ধর্মকে আমি পসন্দ করি নাই। কেননা ইহার প্রতি পদক্ষেপে মহাসম্মানিত ও মহাপরাক্রমশালী খোদার প্রতি অবমাননা রহিয়াছে। একজন দুর্বল মানুষ, যে নিজেকে সাহায্যও করিতে পারে নাই, তাহাকে খোদা সাব্যস্ত করা হইয়াছে এবং তাহাকেই আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা মনে করা হইয়াছে। দুনিয়ার আধিপত্য যাহা আজ আছে আর কাল ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে, উহার সহিত লাঞ্চনা একত্র হইতে পারে না। তাহা হইলে খোদার প্রকৃত আধিপত্যের সহিত এত লাঞ্চনা কিভাবে একত্রিত হইল যে, তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল? তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইল। তাহার মুখে থুথু নিক্ষেপ করা হইল। অবশেষে খৃষ্টানদের ভাষ্য অনুযায়ী তাহাকে এক অভিশপ্ত মৃত্যু বরণ করিতে হইল, যাহা ব্যতীত সে নিজের বান্দাদিগকে

পরিত্রাণ করিতে পারিল না।* এইরূপ দুর্বল খোদার উপর কি কোন ভরসা করা যাইতে পারে এবং খোদাও কি এক নশ্বর মানুষের ন্যায় মরিয়া যায়? এতদ্ব্যতীত কেবল প্রাণই নহে, বরং তাহার বৈধতা ও তাহার মাতার সতীত্বের উপরও ইহুদীরা অপবিত্র অপবাদ লাগাইল এবং ঐ খোদা কিছুই করিতে পারিল না। প্রচণ্ড শক্তি প্রদর্শন করিয়া নিজের নির্দোষ হওয়া প্রমাণ করিতে পারিল না। অতএব এইরূপ খোদাকে মানার জন্য বিবেক বুদ্ধি সায় দিতে পারে না। যে নিজের বিপদগ্রস্ত অবস্থায় মরিয়া গেল এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিল না এবং ইহা বলা যে, সে জানিয়া বুঝিয়া নিজেকে ক্রুশে চড়াইয়া দিল যাহাতে তাহার উম্মতের পাপ ক্ষমা হইয়া যায়—ইহার চাইতে অধিক অযথা ধারণা আর কিছু নাই। যে ব্যক্তি সারা রাত্রি নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া এক বাগানে দোয়া করিল এবং সেই দোয়াও মঞ্জুর হইল না; অতঃপর সে এতখানি ঘাবড়াইয়া গেল যে, ক্রুশে চড়ার সময় 'ইলি ইলি লামা সাবাকতানী' বলিয়া নিজের খোদাকে খোদা বলিয়া ডাকিল এবং এই ভয়ংকর অস্থিরতার মধ্যে বাবা বলিতেও ভুলিয়া গেল—তাহার সম্পর্কে কি কেহ ধারণা করিতে পারে যে, সে স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল? খৃষ্টানদের এই পরস্পর বিরোধী বর্ণনা কে বুঝিতে পারে যে, একাদিকে যীশুকে খোদা সাব্যস্ত করা হয়, কিন্তু অন্যদিকে সেই খোদাই অন্য কোন খোদার সামনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোয়া করে। যেস্থলে তিন খোদা যীশুর মধ্যেই বিদ্যমান ছিল এবং সে তাহাদের

---

* এই অভিশপ্ত মৃত্যুতে মসীহ নিজেই রাজী হইয়া গিয়াছিলেন—এই কথাটি এই প্রমাণ দ্বারা বাতিল হইয়া যায় যে, মসীহ বাগানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোয়া করেন যাহাতে মৃত্যুর পেয়ালা তাহার নিকট হইতে সরিয়া যায়। অতঃপর ক্রুশে চড়ানোর সময় তিনি চিৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন 'ইলি ইলি লামা সাবাকতানী' অর্থাৎ হে আমার খোদা, হে আমার খোদা, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিলে? যদি তিনি এই ক্রুশীয় মৃত্যুতে রাজী ছিলেন তবে তিনি কেন দোয়া করিলেন? মসীহের ক্রুশীয় মৃত্যু খোদাতা'লার পক্ষ হইতে সৃষ্টির উপর এক কৃপা ছিল এবং খোদা সন্তুষ্ট হইয়া এইরূপ কাজ করিয়াছিলেন যাহাতে জগদ্বাসী মসীহের রক্তে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে—এই ধারণা এই প্রমাণ দ্বারা বাতিল হইয়া যায় যে, যদি বা প্রকৃতপক্ষে ঐ দিন খোদার দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল তবে কেন ঐ দিন ভয়ংকর ভূমিকম্প হইল, এমনকি হাইকেল (ইহুদীদের উপাসনালয়) এর পরদা ফাটিয়া গেল এবং কেন ভয়ংকর ধূলার ঝড় আসিল এবং সূর্য অন্ধকারে ঢাকা পড়িল? ইহা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, খোদাতা'লা মসীহকে ক্রুশে চড়ানোর ব্যাপারে ভয়ংকর অসন্তুষ্ট ছিলেন, যদ্দরুন চল্লিশ (৪০) বৎসর পর্যন্ত খোদা ইহুদীদের পিছন ছাড়িলেন না এবং তাহারা বিভিন্ন প্রকারের শাস্তির মধ্যে নিপতিত হইল। প্রথমতঃ তাহারা ভয়ংকর প্লেগে ধ্বংস হইল এবং অবশেষে রোমের তিতুস নামক সম্রাটের হাতে হাজার হাজার ইহুদী মারা গেল।

সমষ্টি ছিল, তাহা হইলে সে কাহার সামনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোয়া করিল ? ইহাতে তো মনে হয় খৃষ্টানদের নিকট ঐ তিন খোদা ছাড়াও অন্য কোন শক্তিশালী খোদা আছে যে তাহারা ব্যতিরেকে পৃথক সত্তা ও তাহাদের উপর শাসনকর্তা এবং যাহার সামনে তিন খোদাকেই কাঁদিতে হইল।

এতদ্ব্যতীত যে উদ্দেশ্যে আত্মহত্যার পথ বাছিয়া লওয়া হইল, সেই উদ্দেশ্যও পূর্ণ হইল না * ।

---

* আফসোস, তৃতীয় শতাব্দীর পর মুসলমানদের বিভিন্ন ফেরকা এই ধর্ম বিশ্বাস হইয়া পড়িল যে, হযরত ঈসা আলায়হেস সালাম ক্রুশ হইতে নিরাপদ থাকিয়া আকাশে জীবিত অবস্থায় চলিয়া গেলেন এবং এখন পর্যন্ত সেখানেই জীবিত অবস্থায় বসিয়া রহিয়াছেন এবং তাহার উপর মৃত্যু আসিল না। এইভাবে এই নির্বোধ মুসলমানেরা খৃষ্ট ধর্মের বড়ই সাহায্য করিল। তাহারা বলে, হযরত ঈসার মৃত্যু সম্পর্কে কুরআন শরীফে কোথাও উল্লেখ নাই। পক্ষান্তরে কুরআন শরীফে কয়েক জায়গায় ব্যাখ্যাসহ তাহার মৃত্যুর উল্লেখ রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, فلما توفيتنى (অর্থঃ যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে—অনুবাদক) আয়াতে (সূরা আল্ মায়েদা : আয়াত ১১৮) কত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ তাঁহার মৃত্যুর প্রমাণ দিতেছে। তাহারা বলে, ما قتلوه وما صلبوه (অর্থ: না তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়াছিল এবং না তাহারা তাহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া নিহত করিয়াছিল—অনুবাদক) আয়াত (সূরা আল্ নেসা : আয়াত ১৫৮) হযরত ঈসার বাঁচিয়া থাকা সম্পর্কে প্রমাণ দিতেছে। তাহাদের এইরূপ বুঝার দরুন কান্না পায়। যে ব্যক্তি ক্রুশ বিদ্ধ হইয়া নিহত হয় না সে কি মরে না ? আমি বারবার বর্ণনা করিয়াছি কুরআন শরীফে ক্রুশে মৃত্যু বরণ না করা এবং ঈসার উন্নীত হওয়ার উল্লেখ হযরত ঈসার জীবিত থাকা প্রমাণ করার জন্য করা হয় নাই ; বরং ঈসা অভিশপ্ত মৃত্যু বরণ করেন নাই এবং মোমেনগণের ন্যায় তাঁহাকে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত করা হইয়াছে—ইহা প্রমাণ করার জন্য ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহুদীদের দাবী রদ করাই ইহার উদ্দেশ্য। কেন-না তাহারা তাঁহার উন্নীত হওয়াকে অস্বীকার করে।

(ক্রমশ:)

(হাকিকাতুল ওহী পুস্তকের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

জুমুআর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

(১৫-৫-৯২ তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-কর্তৃক আহমদীয়া মিশন হাউস, ফ্রান্সে প্রদত্ত জুমুআর খুতবা)

অনুবাদক : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

সফল দায়ী ইলাল্লাহ্ হতে হলে ইহা আবশ্যক যে, তোমরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর দ্বার থেকে ধৈর্য ভিক্ষা করো।

যদি তোমরা এরূপ করো তাহলে তোমাদেরকে খোদাতা'লার সন্নিধান থেকে মহান পরিবর্তনসমূহ সৃষ্টি করার শক্তি প্রদান করা হবে। এ শক্তির সহায়তায় বস্তুতপক্ষে তোমরা ঐ কাজ করে দেখাবে যা দুনিয়াদারদের দৃষ্টিতে বাহ্যতঃ অসম্ভব বলে মনে হয়। প্রত্যেক দেশের আহমদী বন্ধুগণের অবশ্য করণীয় যে, তারা স্ব স্ব দেশের অধিবাসীদেরকে সত্য পথের দিকে নিয়ে আসার জন্যে পূর্ণ মনোযোগ দেবেন। যদি তারা সাহস, ধৈর্য ও মুহাম্মদী চরিত্রে সুসজ্জিত হয়ে তবলীগ করেন তাহলে প্রত্যেক দেশে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ধর্মের ওপরে প্রাণ উৎসর্গকারী বন্ধুগণ সৃষ্টি হয়ে যাবেন।

তাশাহ্হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) কুরআন করীমের নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন:

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا وقال انني من المسلمين ٥
ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بينك و بينه
عداوة كانه ولى حميم ٥ وما يلقها الا الذين صبروا وما يلقها الا ذو حظ عظيم ٥

অর্থাৎ আর ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে অধিক উত্তম যে লোকদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে ও বলে, 'নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্গত?' বস্তুতঃ ভাল ও মন্দ সমান নয়, অতএব তুমি উহা দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত করো যা সর্বোত্তম; ফলে সহসা ঐ ব্যক্তি, যার মধ্যে আর তোমাদের মধ্যে শত্রুতা রয়েছে, তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় হয়ে যাবে। কিন্তু এর অধিকারী কেবল তাদেরকে করা হয় যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং এর অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকে যারা মহাসৌভাগ্যশালী।

(সূরা হামীম আস্ সাজদা : ৩৪-৩৬)

এর পরে হুযূর (আইঃ) বলেন, কুরআন করীমের যে আয়াতগুলো আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি এর সাথে জামা'ত অনেকাংশে পরিচিত হয়ে গেছেন। কেননা

নামাযে প্রায়ই আমি ইহা তেলাওয়াত করে থাকি এবং বহুবার খুতবাতে ঐ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছি যা এ পবিত্র আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ (আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করা)-এর বিষয়।

কুরআন করীমের আয়াতসমূহে এই মহান বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় যে, আপনি নিজের পক্ষ থেকে একবার কতক আয়াতের বিষয়বস্তু খুব খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করে দিলেন এতদ্সত্ত্বেও পুনরায় যখন আপনি দ্বিতীয়বার ওগুলোর ওপরে দৃষ্টি দেন, তখন অবশ্যই এরূপ কোন নতুন বিষয় ঐ আয়াতগুলো থেকেই প্রস্ফুটিত হয় যার দিকে প্রথমে আপনার দৃষ্টি যায়নি। আর যদ্দ্বারা মানব সম্প্রদায়ের জন্যে বিশেষ উপকারের উপকরণ সৃষ্টি হতে পারে।

তবলীগের আধ্যাত্মিক শিকার এবং উহার বিশেষ অবস্থা

এ আয়াতগুলোর ওপরে আমি যখনই দৃষ্টি দিই কিছু না কিছু নতুন কথা দৃষ্টিতে আসে এবং সর্বদা এথেকে কোন নতুন সূক্ষ্ম কথা হাতে এসে যায়। এ জন্যে আমি আজ দ্বিতীয়বার এ বিষয়কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এ আয়াতগুলোর আশ্রয় নিয়েছি। কুরআন করীমে যেখানে তবলীগের বিষয়বস্তু বর্ণনা করে সেখানে অবশ্যই ধৈর্যের বিষয়বস্তুকেও একীভূত করে। কখনও সরাসরিভাবে কখনও পরোক্ষভাবে। তবলীগ এবং ধৈর্যকে পৃথক পৃথক করে একাকীভাবে একটিকে অপরটি থেকে সম্পর্কহীন আকৃতিতে পেশ করা হয়নি। এ আয়াতে যে ধৈর্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে উহা অতি বড় এক চ্যালেঞ্জের ফলে উপস্থাপন-যোগ্য ধৈর্য। সাধারণ অবস্থায় যখন মানুষ কাউকে তবলীগ করে তখন স্বভাবতই একটি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সামনে এসে যায় আর তবলীগ শ্রবণকারী ইহা মনে করে যে, সে আমাকে বিনা কারণে তাঁর দিকে আকর্ষণ করছে। আমাকে শিকার (অর্থাৎ বয়াত—অনুবাদক) করতে চায় আর শিকারের প্রতিক্রিয়া একই রকম হয়—যদিও বা তা জন্তুর হোক কি জানোয়ারের হোক, বা পাখীর হোক। প্রথমে শিকার শিকারী থেকে পালিয়ে বেড়ায়। এজন্যে শিকারের সাথে ধৈর্যের বিষয় স্বাভাবিক কারণেই সম্পৃক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এখানে এসব লোকদের শিকারের কথা বলা হয়েছে যারা নিজেরাই শিকারী এবং শত্রুতায় তারা চরমে গিয়ে পৌঁছেছে।

এ বিষয়ের ওপর চিন্তা করতে গিয়ে আমার সম্মুখে যে কথাগুলো ছিল সেগুলোর ওপরে আমি আপনাদের সামনে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। সাধারণভাবে এই প্রবণতা দেখা যায় যে, যারা সমর্থক, নরম মেজাযী আর যাদের মধ্যে অনিষ্ট নেই কেবল তাদেরকেই তবলীগ করা উচিত। যতদূর পর্যন্ত অভিজ্ঞতা সম্পর্ক রাখে, ইহা ঠিক যে, ঐ সব লোক যাদের মধ্যে কর্তব্যপরায়ণতা দেখা যায়, বাহ্যিকভাবে যাদের মধ্যে নরম মেজায পাওয়া যায় তুলনামূলকভাবে তাদের মধ্যে তবলীগ অধিকতর সুফল দান করে। কিন্তু ইহাকে পরিপূর্ণ মাপকাঠি বানানো যায় না। কতক লোক এরূপ রয়েছে যে, যাদের প্রকৃতির মধ্যে কোমলতা পাওয়া যায় কিন্তু তাদের কোমলতা ছাড় দেয়ার প্রবণতার ফলস্বরূপ। তাদের মধ্যে

কোমলতা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে নয় বরং কপটতার ফলস্বরূপ পাওয়া যায়। যখন আহমদীদের এরূপ লোকের সাথে তবলীগ করতে হয় তখন কখনও এমন হয় যে, বয়স শেষ হয়ে যায় কিন্তু সে এক ইঞ্চিও সম্মুখে অগ্রসর হয় না।

নিরীহ আত্মভোলা আহমদী মনে করে যে, সে খুব ভদ্রলোক কখনও বিরোধিতা করে না, সর্বদা ভাল ভাল কথা বলে। কিন্তু সে নিজ জায়গায় এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে যেভাবে সে প্রথমে ছিল আর এভাবে তার সাথে সম্পর্ক রেখে মানুষ নিজের বয়স খুইয়ে দেয়। যতদূর পর্যন্ত মানবীয় সম্পর্কের ব্যাপার, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে। কিন্তু যখন তবলীগের নিয়্যতে সম্পর্ক রাখা হয় তখন তার দৃষ্টিতে একটি উদ্দেশ্যই থাকে। উদ্দেশ্য এই হয় যে, যাকে তবলীগ করা হয় সে যেন নিকট থেকে নিকটে চলে আসে এমন কি সে যেন সর্বৈব সত্যতার ঝুলির মধ্যে এসে পড়ে। যে পর্যন্ত সাধারণ সম্পর্কের কথা, এথেকে কেউ কাউকে নিষেধ করতে পারে না। কুরআন করীম উপদেশ দেয় যে, দুনিয়ার সাধারণ সম্পর্কের ব্যাপারে তোমরা প্রত্যেকের সাথে সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত রাখো। কিন্তু যেখানে উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিতে রেখে সম্পর্ক হয় সেখানে উদ্দেশ্য বলে দেবে যে, কতক্ষণ পর্যন্ত সম্পর্ক রাখা উচিত আর এও বলে দেবে যে, সম্পর্ক বিনা লাভে তো হয় নি। অতএব যে সম্পর্ক তবলীগের নিয়্যতে রাখা হয় এতে ইহা আবশ্যক যে, মানুষ যেন এ কথার প্রতি দৃষ্টি রাখে যে, যার সাথে সম্পর্ক রাখা হচ্ছে সে সময় নষ্ট তো করছে না। সে নিকটবর্তী হচ্ছে কি হচ্ছে না। যদি এক ব্যক্তি নিজের জায়গায় আটকে যায় আর মানুষ তার সাথে বয়স খুইয়ে দেয় তাহলে তার বয়স বৃথা যাবে। কেবল তারই নয় বরং যাদের প্রতি সে দৃষ্টি দিচ্ছিল এরূপ আরও অনেক লোকের বয়স বৃথা হয়ে যেতে থাকবে। যখন একজন শিকারীর সময় বৃথা নষ্ট হয়ে যায় তখন অনেক প্রকারের ক্ষতি এর মধ্যে নিহিত থাকে। সে এরূপ শিকারের পিছনে নিয়োজিত ছিল যাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য শিকার তার হাতে আসতে পারতো। কিন্তু তবলীগের সম্পর্ক তো রূহানী শিকারের সাথেই হয়। দুনিয়ার শিকারের বেলায় তো অবস্থার এই হয়ে থাকে যে, যদি এক শিকারী কোন এক শিকারের পিছনে লেগে যায় তো ইহা অন্য পাখীদের জন্যে সৌভাগ্যের কারণ হয়। তাদের ভাগ্য ফিরে যায় এই কারণে যে, এক নির্বোধ শিকারী ভুল পথে চলে গেল। কিন্তু ঐ রূহানী পাখীরা যারা ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর পাখী তাদের তো জীবিত করার জন্যে মারা হয়। সুতরাং হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) যখন খোদাতা'লার নিকট থেকে শিকারের পন্থা শিখেছিলেন তখন তিনি এ কথাই জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, মৃতদেরকে কিভাবে জীবিত করা হয়? অতএব মোমেন কেবল মাত্র বিপরীত ফল লাভের জন্যে শিকার করে। সাধারণতঃ দুনিয়ার শিকারী শিকার মারার জন্যেই শিকার করে থাকে। মোমেন জীবন দান করার জন্যে শিকার করে। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহী ওয়া সাল্লামেরও এই গুণ

বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখনই আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল তোমাদেরকে ডাকেন 'লে ইউহ্‌য়ী কুম' যেন তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেন তাহলে 'ইস্‌তাজীবু' ঐ সময় তাদের ডাকে 'লাব্বায়েক' (উপস্থিত) বলে সাড়া দাও। অতএব যখন আমি 'শিকার' পরিভাষাটি ব্যবহার করি তখন স্মরণ রাখা দরকার যে, আমাদেরকে জীবিত করার জন্যে শিকার করতে হবে। অতএব ঐ শিকার যা কোন ব্যক্তির অবহেলার কারণে জীবন লাভ করা থেকে বঞ্চিত থেকে গেল এবং ভ্রান্ত দৃষ্টির ফলে বেখেয়ালীপনার শিকার হয়ে গেল আর এই অবস্থায় তার প্রাণ বের হয়ে গেল তার পাপের কিছু অংশ হলেও তার (অর্থাৎ শিকারীর—অনুবাদক) স্কন্ধে চেপে গেছে। এজন্যে মোমেনের নিজ জীবনের সময়কে খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তত্ত্বাবধান করতে হয়। তার সময় খুবই মূল্যবান। তার সময়ের প্রতি মুহূর্তের একটি হিসাব আছে আর সাধারণের সময়ের মত তার সময় নয়। তাকে তার সময়ের প্রতিটি অংশের কদর করতে হয় অথবা উহার হিসাব চুকিয়ে ফেলতে হয়। যদি কদর না করা হয় তাহলে খোদার নিকট তাকে হিসেব দিতে হবে।

ঘোরতর শত্রুকে বন্ধু বানানোই তবলীগি শিকার

অতএব যে পর্যন্ত এ বিষয়ের সাথে সম্পর্ক এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সম্ভ্রান্ত এবং কোমল (হৃদয়ের) লোকদের মধ্যে তবলীগ করা জরুরী। কিন্তু সাথে সাথে তত্ত্বাবধান খুবই জরুরী যে, এ তবলীগে উপকার আছে কি নেই আর যদি থাকে তাতে কতটুকু আছে। কিছু দিন পরে এ ধরনের লোককে আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করা হোক আর মানুষ এ ধরনের লোক থেকে হাত গুটিয়ে নিক যারা কোন প্রকারেই প্রভাবান্বিত হয় না। কিন্তু এর বিপরীতেও একটি চিত্র আছে। কতক লোক খুব বিরোধিতা করে আর সাধারণভাবে লোক এসব বিরুদ্ধবাদীদেরকে শিকার করে না। এদের ব্যাপারে ফিরেও তাকায় না। কুরআন করীমের এ আয়াতে বিশেষভাবে ঐ সব লোকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—ফা ইযাল্লাযী বায়নাকা ওয়া বায়নাহূ আদাওয়াতুন—ফলে ঐ ব্যক্তি যার মধ্যে ও তোমার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে—অনুবাদক) হে মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) আর তাঁর সাথী শিকারীগণ! তোমরা বড় বড় রক্তপিপাসুদেরকে শিকার করতে বের হয়েছে এমন সব লোকদের ওপর হাত তুলতে বের হয়েছো যারা তোমাদের শত্রু। যখন তাদের কর্তৃত্ব থাকে তখন তারা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেয়, তোমাদেরকে নিঃশেষ ও বিফল করে দেয়, তোমাদের কোন অস্তিত্বই রাখতে চায় না। যাও আর খোদার নাম নিয়ে তাদের ওপর হাত তোল তোমরা কিভাবে তাদের ওপর বিজয়ী হবে আমরা তোমাদেরকে এর রহস্য শিখিয়ে দিচ্ছি। রহস্যের কথাতো পরে আসে। প্রথমে ইহা দেখ যে, মোমেনের জন্যে কত উচ্চ উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে! ফা ইযাল্লাযী বায়নাকা ওয়া বায়নাহূ আদাওয়াতুন—হঠাৎ তোমরা কি দেখবে! দেখবে যে, ঐ ব্যক্তি যে তোমার ভীষণ শত্রু—কাআন্নাহূ ওয়ালিউন হামীম—সে তোমার প্রাণের

বন্ধুতে পরিণত হয়ে গেছে। এর মধ্যে এ কথার উপদেশ রয়েছে যে, যেসব ধর্মের বড় বড় বিরুদ্ধবাদী ও বাহ্যিক শক্তি প্রয়োগে ধর্মের সাথে সংঘর্ষ বাঁধাবার লোকেরা রয়েছে যাদের সম্বন্ধে বাহ্যিকভাবে তোমরা নিরাশ হয়েছো তাদের প্রতিও তোমরা দৃষ্টি দাও। এদের মধ্যেও আল্লাহ্‌তা'লা এমন মণি-মুক্তা (যোগ্যতা) গুপ্ত রেখেছেন যে, যখন তারা হাতে আসবে তখন বহু মূল্যবান ভাণ্ডার হাতে আসবে। সুতরাং ইসলামের প্রারম্ভে আমরা এই অবস্থাই দেখি যে, যারা জাহেলিয়্যতের যুগে ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিল তারা যখন মুসলমান হলেন তখন ইসলামের সবচে' বড় বন্ধু হয়ে গেলেন এবং তাদের কারণে ইসলামের অসাধারণ শক্তি লাভ হলো। অতএব, আপনারা আপনাদের তবলীগে শত্রুদের প্রতি দৃষ্টি দিন কেননা আপনারা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর সেবক। মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহে ওয়াল্লাযীনা মা'আহু আশিদ্দাউ আলাল কুফ্‌ফারে [মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং যারা তার সাথে রয়েছে তারা কাফেরদের ব্যাপারে খুবই কঠোর—অনুবাদক]-এর ভিত্তিতে বলা যায় যে, আপনারা ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সাথী হওয়ার দাবীদার আর তাঁর গোলামী করার জন্যে গৌরবান্বিত। সুতরাং শিকারের ঐ পদ্ধতি শিখুন যা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পদ্ধতি। ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সুন্নতকে আরও তীক্ষ্ণ করে দেয়া হয়েছে, আরও উজ্জ্বল করে দেয়া হয়েছে। ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর ওপর তো এই আদেশ ছিল যে, ঐ পাখীগুলোকে ধরো যারা তোমার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে পারে আর ইহাই তবলীগের প্রথম পর্যায়। যারা ভদ্রতার সাথে কথা শুনে, আর যাদেরকে সামান্য আদর করলে তারা স্বভাবতই আদরের জবাব আদরের মাধ্যমে দেয়, তারাই ইব্‌রাহীমি পাখী। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওপর যেসব পাখীদের সোপর্দ করা হয়েছে তারা হিংস্র শত্রু। তারা তাঁর দর্শনও সহ্য করতে পারত না। এই কারণেই দেখা যায় যে, আঁ-হযরত (সাঃ) যাদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন এনে দেখালেন তারা এ ধরনের লোক ছিল যাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তোমার হিংস্র রক্তপিপাসু শত্রু প্রাণের বন্ধু হয়ে যাবে। আঁ-হযরত (সাঃ) এমন পাথরগুলোকে মোমে পরিণত করলেন এমন পাথরগুলোকে বিদীর্ণ করলেন আর এর মধ্য থেকে এমন প্রস্রবণ স্ফুরণ ঘটালেন যে, নবীদের (আঃ) ইতিহাসে এর কোন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। কোন এক সময়ে জনৈক সাহাবী যিনি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জীবনে তাঁর সাহচর্যে কিছুদিন কাটিয়ে ছিলেন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁকে কেউ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমাদের নিকট আঁ-হযরত (সাঃ)-এর চেহারার বিবরণ প্রদান করুন। আমরা আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই কেমন আপনি নিজ চোখে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে দেখেছেন। যে প্রীতি ও ভালবাসার সাথে আপনি তা বর্ণনা করতে পারবেন অন্য আর কেউ তা পারবে না। আপনি আমাদেরকে বলুন যে, আঁ-হযরত (সাঃ) কিরূপ ছিলেন। একথা শুনার পরে সেই সাহাবী জবাব দেবার পরিবর্তে বিচলিত হয়ে কান্না শুরু করে দিলেন। তাঁর হেচ্‌কি বন্ধ হলে প্রশ্নকর্তা আশ্চর্য হয়ে

ভাবল যে, হয়ত তার কোন ত্রুটি হয়ে থাকবে। তিনি মনে করলেন, আমি তো শুধু এতটুকুই জানতে চেয়েছি যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর চেহারার বর্ণনা দিন। অর্থাৎ ইহা বলুন যে, তাঁর আকৃতি কিরূপ ছিল। কিন্তু এ ভদ্রলোক চেহারা বর্ণনার পরিবর্তে কান্না শুরু করে দিলেন। যখন কিছুক্ষণ পরে ঐ সাহাবী নিজের আবেগআপ্লুতভাব কাটিয়ে উঠলেন তখন জবাব এই দিলেন যে, দেখ! আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সময় আমার জীবনের দু'টি অবস্থা এসেছিল; প্রথমতঃ অবস্থা এই ছিল যে, কঠোর শত্রুতাবশতঃ ঘৃণার কারণে আমি তাঁর প্রতি তাকাতে পারি নি, তাঁর নাম শুনা মাত্রই এরূপ বিরক্তি লাগত এবং এরূপ রাগ হতাম যে, বহু সুযোগ আসা সত্ত্বেও ঘৃণায় তাঁর দিকে চোখ তুলে দেখতাম না। পুনরায় যখন মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর প্রেমের দাস হলাম তখন অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে এরূপ হয়ে গেল যে, ভালবাসার আকর্ষণে এবং ভালবাসার কারণে ঐ অস্তিত্বের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারিনি, তাই আজ যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চেহারা কিরূপ ছিল তাহলে খোদার কসম, আমি বলতে পারি না। কেননা আমার দৃষ্টি ঘৃণায় কখনও তাঁর চেহারা দেখে নি আর কখনও ভালবাসার আধিক্যের প্রভাবে দেখে নি আর প্রকৃতপক্ষে আমি জানি না যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্র চেহারা বিস্তারিতরূপে কেমন ছিল। অতঃপর দেখুন ঐ সাহাবী (রাঃ) এ আয়াতে করীমার কিরূপ জীবন্ত সাক্ষী ছিলেন যে—ফা ইযাল্লাযী বায়নাকা ওয়া বায়নাহূ আদাওয়াতুন কাআন্নাহূ ওলীউন হামীম—। খোদাতা'লা বলেন, যেভাবে আমরা বলি এভাবে তোমরা তবলীগ করে দেখো আর আমরা তোমাদের বলছি যে, শত্রুদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে আশ্চর্যজনকভাবে ভালবাসার পাত্র মিলে যাবে। সুতরাং শত্রুদের উপেক্ষা করো না এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জীবনে তো এই মোজেযা এতবার সংঘটিত হয়েছে এবং এত বেশী হয়েছে যে, উহার কোন হিসেব নেই।

ঘোরতর শত্রুকে বন্ধুত্বে পরিবর্তিত করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

প্রথমদিকে সমগ্র আরবের ঘৃণার অবস্থা প্রায় পূর্বোক্ত রূপ (তীব্র) ছিল। হযরত খালেদ বিন ওলীদ (রাঃ)-কে দেখুন, তিনি কিরূপ শত্রু ছিলেন। ঐ একটি ঘটনা যা উহুদের দিনে ঘটেছিল। যখনই লোকেরা ইহা পাঠ করে তখনই তাদের প্রাণে উহার দুঃখ এমনভাবে তাজা হয়ে যায় যেন ইহা গতকালের ঘটনা। উহুদের যুদ্ধে আঁ-হযরত (সাঃ) আহত এবং পরিশ্রান্ত হয়ে শহীদানের ন্যায় ভূমিতে পড়ে গেলেন এবং তাঁর ওপরে অন্যান্য মৃত দেহ এসে পড়ল। ইহা এরূপ কষ্টদায়ক ঘটনা যে, যখনই মানুষ এ ঘটনা পাঠ করে তখনই তার অবস্থা আশ্চর্যজনকভাবে বিগলিত হয়ে যায়, অশ্রুসজল নেত্র ব্যতিরেকে এ ঘটনা পাঠ করা যায় না। এ হৃদয়বিদারক ঘটনায় সবচে' সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করেন খালেদ বিন ওলীদ। সে সময়ে তিনিই ছিলেন মক্কার কাফেরদের সেই সেনাপতি যিনি সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন এবং বুঝলেন যে, মুসলমানদের কি

ত্রুটি হয়েছে। তিনি পলায়নপর কাফের সৈন্যদের গতি রুদ্ধ করে দিলেন এবং নিজস্ব অশ্বারোহীদের নিয়ে পিছন দিক দিয়ে মুসলমানদের ওপরে আক্রমণ চালালেন এবং যে বিজয় চূড়ান্ত হওয়ার পথে ছিল সাময়িকভাবে তা পরাজয়ে পরিবর্তিত করে দিলেন। কিন্তু তাই খালেদ বিন ওলীদই যখন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রেমের বাঁধনে আটকে পড়লেন এবং যখন তাঁর প্রেমের তীরে তিনি বিদ্ধ হলেন তখন অবস্থা বদলে এমনই হয়ে গেল যে, এর পর জীবনে তিনি প্রতিটি জেহাদে ঐ উৎসাহের সাথে অংশ নিলেন যে, হায় আমি যদি শহীদ হতে পারতাম! কিন্তু এ আফসোস তাঁর পূর্ণ হয়নি। তিনি ইসলামের জন্যে এত বেশী জেহাদ করছেন এবং এরূপ শান-শওকত পূর্ণ নেতৃত্ব দিয়েছেন যে, ইসলামের জেহাদের নাম নেবার সাথে সাথে সহসাই তাঁর নাম সামনে এসে যায়। কিন্তু এমন অবস্থায় তিনি প্রাণ ত্যাগ করলেন যে, তিনি বিছানায় পড়ে ছিলেন। যখন প্রাণ বায়ু নির্গত হওয়ার উপক্রম হলো তখন সাথীদের বললেন; আমার শরীরের কাপড় উঠাও। তারা কাপড় উঠালেন। তখন তিনি বললেন যে, শরীরের কোন এক ইঞ্চি দেখাও যেখানে আঘাতের চিহ্ন নেই। তোমরা কি অবগত আছো যে, কেন আমি এ আঘাতগুলো পেয়েছি? এই শখে পেয়েছি যে, আমি, মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর ধর্মের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করবো এবং আমিও শহীদের মধ্যে গণ্য হবো। কিন্তু বড়ই আফসোস যে, আমার ভাগ্যে তা হয় নি। আর আজ বিছানার ওপরে জীবন দিচ্ছি। তিনি এই আয়াতের সত্যতা প্রতিপন্ন করেছেন আর জীবন ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়েছেন যে, মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) সাধারণ পাখীদের শিকারী নন। ইনি তো শিকারী পাখীদের শিকারী, হিংস্র জন্তুদেরও শিকারী এবং উহাদের চেহারা এভাবে বদলে দেন যে, জন্তুদেরকে মানুষ আর মানুষদেরকে খোদা-যুক্ত মানুষ বানিয়ে দেন। ইহা ঐ আয়াতের বিষয়বস্তু যে, ফা ইযাল্লাযী বায়নাকা ও বায়নাহূ আদাওয়াতুন কাআন্নাহূ ওলীউন হামীম।

অতএব, যদি আমরা—যেভাবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর না কেবল দাস বরং প্রেমিক দাস হই যদি আমাদেরকে এ উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে যে, মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর সুন্নতকে দ্বিতীয়বার জীবিত করি এবং জীবিত করে সমগ্র বিশ্বে জারি করে দেই তাহলে পুনরায় আমাদের অবশ্য করণীয় যে, আমাদের তো ঐ কথার বাসনা জেগে যাওয়া উচিত, ঐ ধ্যান জেগে যাওয়া উচিত যে, নিজ অস্তিত্বের মধ্যে কেবল মুহাম্মদ (সাঃ)-কে যেন জীবন্ত করে দেখাই।

দাওয়াত ইলাল্লাহ্-এর মুহাম্মদী শান ও মর্যাদা নিজের মধ্যে জীবন্ত করুন

মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-দু'টি পদ্ধতিতে জীবিত আছেন। প্রথমতঃ তিনি সর্বকালের জন্যে স্বীয় খোদার সাথে জীবিত আছেন। আর ঐ জীবনের ওপর কখনও মৃত্যু আসতে পারে না। তাঁর আর একটি জীবন উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে রয়েছে। যেখানে কোন মুসলমান

আধ্যাত্মিকভাবে মারা যায় সেখানে তাঁর জীবনের মধ্যে কম্‌তি দেখা দেয়। বিপরীত দিকে যদি কোন মুসলমান আধ্যাত্মিকভাবে জীবন লাভ করে সেখানে মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর অপর একটি জীবন লাভ হয়। ইহা ঐ জীবন যার সম্পর্ক মুহাম্মদী দাসের সাথে। ইহা ঐ জীবন যার সম্পর্কে আজ জামাতে আহমদীয়ার সাথে। অতএব, মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর আদর্শকে প্রতিটি ক্ষেত্রে যখনই জীবিত করার সৌভাগ্য আপনি লাভ করেন তখনই দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে, আপনি মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর একটি মর্যাদাকে নিজের মধ্যে জীবিত করলেন। দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র মর্যাদাও নিজের মধ্যে পুরোপুরি জীবিত করুন। এই বিষয় যা আপনাদের সম্মুখে বর্ণনা করছি আর আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে শত্রুদেরকে এবং শত্রুদের নেতৃবৃন্দকে ভয় করবেন না। তাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছে যান আর প্রজ্ঞা ও ভালবাসার সাথে এ পদ্ধতিতে যে পদ্ধতিতে এ আয়াত আপনাদেরকে তবলীগের গুঢ় তত্ত্ব শিখিয়েছে তাদেরকে অবশ্যই পয়গাম পৌঁছান। যারা এভাবে কাজ করে তাদেরকে কখনও কখনও খোদাতা'লার আশিস বিস্ময়করভাবে অগণিত ফল দান করে কেননা শত্রুদের মধ্যে যারা নেতৃবৃন্দ রয়েছে যদি তারা এসে যায় তবে কেবল তারা একাই আসবেন না বরং জাতির পর জাতি আসতে থাকবে। কতিপয় দেশ থেকে তবলীগের রিপোর্ট আসে এদের মধ্যে কখনও অধিক সংখ্যায় ইহা পাওয়া যায় যে, অমুক এলাকায় কেউ আহমদীয়াতের কথা শুনতে চাচ্ছিল না। ওখানকার সবচে' যে ঘোরতর শত্রু আমরা তার নিকট পর্যন্ত গিয়েছি এবং যখন কথাবার্তা বলেছি তখন ইহা জেনে আশ্চর্যান্বিত হয়েছি যে, তাদের মধ্যে (সত্য গ্রহণের যোগ্যতার) সৌভাগ্য পাওয়া গেছে। কিছু দিন পর তিনি তাঁর চালচলনকে পরিবর্তন করলেন। এর পর তিনি আগ্রহ দেখাতে শুরু করলেন। পরে তিনি খোদার ফযলে আহমদী হলেন। আর এর ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে আহমদীয়াত বিস্তৃত হতে আরম্ভ হয়েছে। এ রকম একটি রিপোর্ট কিছু দিন হল ইন্দোনেশিয়া থেকেও পাওয়া গেছে যে, জনৈক ব্যক্তি যিনি একটি এলাকার প্রধান ছিলেন, বড় সম্মানিত ও বহু লোকের ওপর প্রভাব রাখতেন তিনি। প্রথমে তিনি আহমদীয়াতের খুবই বিরোধিতা করেছেন। যখন তিনি আহমদী হলেন তখন তাঁর ব্রত এই হলো যে, তিনি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতেন আর সেখানে ঘোষণা দিতেন যে, দেখ, তোমরা আমাকে কেমন দেখেছিলে। তাঁরা যখন তাঁকে বলত যে, আপনি তো আমাদের পীর ছিলেন এবং পীর আছেন। তখন তিনি বলতেন, এখন তো আর পীর নই এখন বল, তোমরা কি করবে? কখনও কখনও গ্রামবাসী, যারা সম্ভ্রান্ত তারা বলত, আপনি এখনও আমাদের পীর, যেখানে আপনি পা রেখেছেন আমাদের পাও সেখানে পড়বে। যেখানে আহমদীয়াতের চিহ্নও ছিল না সেখানে অধিক সংখ্যায় জামাত সৃষ্টি হওয়া শুরু হলো। ইহা এক দেশেরই কথা নয়। প্রত্যেক দেশেই এ কথা এভাবে সত্যতায় পর্যবসিত হচ্ছে। এখানেও এমন সব যুবক আছে

বা অন্যান্য বয়সের লোক রয়েছেন যাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণ পাওয়া যায়। এরূপভাবে নেতৃত্বের গুণের সাথে সাথে ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতার প্রবণতাও তাদের মধ্যে পাওয়া যায়। আর তারা ইসলামের বিরোধিতা অথবা সত্যের বিরোধিতায় এমন লক্ষণীয়ভাবে চেষ্টা করতে থাকে যতটুকু চেষ্টা তাদের দ্বারা বরা সম্ভবপর তাতে তারা ত্রুটি করে না। তাদের নিকটেও আমাদের পৌঁছা উচিত। আর এরূপে তাদের নিকট পৌঁছাবারও অনেক উপায় রয়েছে। ফ্রান্সের দিকে লক্ষ্য রেখে যখন আমি কথা বলি তখন আমি অবহিত আছি যে, আজ এখানে জামাত খুবই ক্ষুদ্র এবং ফ্রেন্স জাতির সাথে এখানকার জামাত এখনও গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। ফলে ফ্রান্সে আজ পর্যন্ত যে তবলীগ হয়েছে তার অধিকও বেশীই হয়েছে অ-ফ্রেন্স লোকদের মধ্যে। উদাহরণস্বরূপ এখানে মরক্কো থেকে আগত লোক রয়েছেন। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে এসে বসতি স্থাপনকারী লোক রয়েছেন। এখানে পাকিস্তানী রয়েছেন। যে পর্যন্ত তবলীগ হয়েছে সাধারণভাবে এসব লোকদের মধ্যেই হয়েছে। ফ্রান্সের অধিবাসীদের কথা যখন ওঠে তখন বলা হয় যে, তারা দুনিয়া পুজারী, দুনিয়াদার। তাদের মধ্যে ধর্মের জন্যে কোন উৎসাহ নেই। যখন আমরা তাদের সাথে কথা বলি তখন তারা তিক্ত ভাষায় জবাব দিয়ে দেয়। প্রত্যেক জাতিতে খোদাতা'লা পবিত্র প্রকৃতির লোক রেখেছেন। শত্রুদের শত্রুতার ছলনার মধ্যেও আপনাদের পবিত্র প্রকৃতির লোকের সাক্ষাৎ মিলবে। যাকে ভয়ানক শত্রু বলে প্রতিভাত হয় সে যখন (ঘুক্তির কাছে) কাবু হয় তখন তার মধ্যে এক বিস্ময়কর বিপ্লবের সৃষ্টি হয়ে যায়। সুতরাং আপনারা যদি সাহস হারা হয়ে যান তাহলে ফ্রান্সের সাহসও হারিয়ে যাবে। এক জাতির ভাগ্য আপনাদের স্কন্ধে সোপর্দ করা হয়েছে। আপনাদের সাহস হারানো উচিৎ নয় কেননা যখন দায়ী ইলাল্লাহ্ (আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারী) সাহস হারিয়ে ফেলে তখন প্রকৃতপক্ষে সমগ্র জাতি সাহস হারিয়ে ফেলে।

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সফলতা লাভের জন্যে দৃষ্টান্তমূলক ধৈর্যের প্রয়োজন

উপদেশ দেয়া বড়ই কঠিন কাজ। উপদেশ দেয়ার জন্যে অসাধারণ শক্তির প্রয়োজন। এজন্যে কুরআন করীম ধৈর্যের তাগিদ দিয়েছে। আর ইহা ঐ দ্বিতীয় দিক যা আমি আপনাদের সামনে রাখতে চাই। বলা হয়েছে—ফা ইযাল্লাযী বায়নাকা ওয়া বায়নাহূ আদাওয়াতুন কায়ান্নাহূ ওলীউন হামীম, ওমা ইউলাক্কাহা ইল্লাল্লাযীনা সাবারূ, ওমা ইউলাক্কাহা ইল্লা যূ হায্যিন আযীম। (অর্থাৎ ফলে সহসা ঐ ব্যক্তি, যার মধ্যে আর তোমাদের মধ্যে শত্রুতা রয়েছে, তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় হয়ে যাবে। কিন্তু এর অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকে যারা ধৈর্য ধারণ করে আর এর অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকে যারা মহাসৌভাগ্যশালী—অনুবাদক)। কিন্তু স্মরণ রেখো, এ মোজেযা এমনিতেই প্রকাশিত হয়ে যায় না। শত্রুকে বন্ধু বানানো সহজ কাজ নয়। এর জন্যে ধৈর্যের প্রয়োজন। যেভাবে বলা হয়েছে—ওমা ইউলাক্কাহা ইল্লাল্লাযীনা সাবারূ (অর্থাৎ

বিত্ত এর অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকে যারা ধৈর্য ধারণ করে—অনুবাদক) কিন্তু এ প্রসঙ্গে আরও কিছুর প্রয়োজন রয়েছে। কেননা সকল সম্বোধন এক বচন হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)। তাঁকে যে ধৈর্য শক্তি দান করা হয়েছিল তা সবর (ধৈর্য) শব্দ দ্বারা পুরোপুরি প্রকাশ হতে পারে না। এ জন্যে যেখানে সাধারণ মোমেনগণের ধৈর্যের বর্ণনা করে বহু বচনের রূপে ইহা বলা হয়েছে যে, ওমা ইউলাক্কাহা ইল্লাল্লাযীনা সাবারূ—সেখানে সাথে সাথে পুনরায় একবচনের কথা বলা হয়েছে—ওমা ইউলাক্কাহা ইল্লা যুহায্‌যেন আযীম। এখন বহু বচনে কথা বলা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। যেভাবে প্রথমে 'কা' 'কা' অর্থাৎ তোমার, তোমার, বলে সম্বোধন করা হচ্ছিল। মোমেনদের কথা সাধারণভাবে বর্ণনা করাতেই খোদা পুনরায় এ বিষয়ের প্রতি অর্থাৎ একবচনের প্রতি দিক পালটালেন অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর প্রসঙ্গে বলেন—ওমা ইউলাক্কাহা ইল্লা যুহায্‌যেন আযীম—অর্থাৎ এই মহান উদ্দেশ্যকে এক মহান চরিত্রের অংশ দেয়া হয়েছে যা মানুষ ব্যতিরেকে আর কেউ পুরো করতে পারে না। ঐ লোক যে, ধৈর্য ধারণ করে তারও এর অংশ মিলবে। কিন্তু আসল সফলতা সাধারণ নয় এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সফলতা তা তাদের ভাগ্যে মিলবে যাদেরকে মহান অংশ দেয়া হয়। 'হায্‌য' অংশ বা খণ্ডকে বলে। সুতরাং বলা হয়েছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সফলতা তাদেরকে দেয়া হবে যারা মহা অংশ লাভ করেছে। কোন্ জিনিষের অংশ? একথা বলা হয়নি। ধৈর্যের কথা হচ্ছিল। এজন্যে প্রথমেই ধেয়ান ধৈর্যের প্রতি ধাবিত হয়। আর এ পর্যায়ে যখন আমরা আঁ-হযরত (সাঃ)-কে দেখি তখন নিঃসন্দেহে তাঁর চেয়ে বড় ধৈর্যশীল মানুষ দুনিয়াতে সৃষ্টি হয়নি। প্রতিটি ক্ষেত্রে ধৈর্যের প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি (সাঃ) এমন মর্যাদার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন যে, যার কোন দৃষ্টান্ত কখনও পরিদৃষ্ট হয় না। ব্যক্তিগত ক্ষতির বেলায় দেখুন, বিভিন্ন অবস্থায় ব্যক্তিগত ক্ষতির বেলায় দেখুন, নিজের নিকটাত্মীয় ও প্রিয়দের দুঃখ বরদাশ্‌ত করার বেলায় দেখুন। ধৈর্যের যত প্রকার পরীক্ষা আসতে পারে তার সবই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন পরতে পরতে এসেছে এবং বিস্ময়করভাবে তিনি (সাঃ) প্রতিটি পরীক্ষায় সমুজ্জ্বল সফলতা লাভ করেছেন—চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় এমন উজ্জ্বল সফলতা ছিলো। প্রথম জীবনে কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল—অর্থাৎ এতীম হয়েই তিনি জন্ম গ্রহণ করলেন। আর ছোট বয়সেই তিনি মাকে হারালেন। শৈশবে পিতা-মাতার অভাবে তাঁকে (সাঃ) অন্যের দয়া ও দাক্ষিণ্যে জীবন অতিবাহিত করতে হল। আর এমন ধৈর্যের সাথে, এমন মর্যাদার সাথে তিনি (সাঃ) এসব পর্যায়কে অতিক্রম করলেন যে, শূন্যতার সামান্য অনুভূতিও তিনি (সাঃ) তাঁর মধ্যে প্রবেশ করতে দিলেন না।

আঁ হযরত (সাঃ)-এর ধৈর্যের দৃষ্টান্তবিহীন নমুনা

ধৈর্যের পরীক্ষার সময় মানুষ সাধারণভাবে নেতিবাচক চিহ্নাদি দেখতে পায়। কিন্তু আমি মানুষের প্রকৃতির ওপরে যতটুকু গভীর দৃষ্টি দিয়েছি তাতে এতীমের জন্যে সবচে' বড় পরীক্ষা হলো শূন্যতার অনুভূতির পরীক্ষা। ঐ এতীম যে ধৈর্য ধারণ করতে পারে না সে অবশ্যই শূন্যতার অনুভূতির শিকারে পরিণত হয় আর শূন্যতার অনুভূতি তাই খুবই ভয়ানক রূপ পরিগ্রহ করে। দুনিয়ার অধিকাংশ বক্র বুদ্ধির লোক, ধ্বংসাত্মক বুদ্ধির লোক, ধ্বংসাত্মক বুদ্ধির লোক, দুনিয়াকে ভুল দর্শন দান করার লোক,—তাদের সম্বন্ধে যদি আপনি হিসেব নেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, তাদের জীবনে তারা কোন না কোন পর্যায়ে শূন্যতার অনুভূতির শিকার হয়েছে। আঁ হযরত (সাঃ) তাঁর দুঃখ ও এতীম অবস্থায় এসব পরিস্থিতির প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া ব্যতিরেকে এমন শান ও মর্যাদার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন যে, তাঁর (সাঃ) ওপর মহান কাজ সোপর্দ করা হয়েছে অর্থাৎ যে কাজ তাঁর ওপর ন্যস্ত করা হয় তা অন্য কোন নবীকে কেবল দেয়াই হয় নি বরং তার এক সামান্য অংশও দেয়া হয়নি। সারা জগৎ খোদাতা'লার দরবারে নিয়ে আসা এমন এক ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল যাঁর না বাবা ছিল আর না মা, অন্যের দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপরে লালিত পালিত হচ্ছিলেন। আর তিনি যখন দাবী করলেন তখন সমগ্র জাতি তাঁর ঘোরতর শত্রু হয়ে গেল। ইহা হায্ যে আযীম—মহান অংশীদারিত্বের কথা হচ্ছিল। ধৈর্যের অংশ লাভ হলো তো এত বড় যে, এর কোন দৃষ্টান্ত দুনিয়ার কোথাও দেখা যায় না। অতঃপর তাঁর পুত্র হলো। বলা হয় যে, ১১টি পুত্র সন্তান হয়েছিল। আর ১১টির ১১টিই বাল্য বয়সে, খুবই শৈশবে বা কয়েক বছর বাদেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। প্রত্যেক শিশু জন্ম নেয়ার সময়ে শত্রুরা হাসা-হাসি করত ও ঠাট্টা-তামাশা করত আর তাঁর সম্বন্ধে বলত যে, দেখ! সে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাবে। সে নাকি আবার দুনিয়ার বাদশাহ্ হবার দাবী করে! আমার মনে আছে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রসঙ্গে আমরা এ ঘটনা পড়তাম যে, বশীর আউয়ালের মৃত্যুর পর শত্রুরা কিভাবে বগল বাজাল, কিভাবে সাহাবাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হলো। যখন আমরা সাহাবাদের (রাঃ) ঘটনাসমূহ পাঠ করি তখন জানা যায় যে, তাঁরা ভীষণ কষ্টের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ওপর কোন প্রভাব সৃষ্টি হয়নি। তিনি জানতেন যে, খোদার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে। এ শিশু মারা গেছে তো তকদীর অনুযায়ী অন্য কোন শিশু পরে দেয়া হবে। কিন্তু সাহাবা (রাঃ) জানেন যে, তাঁর অন্তরের অবস্থা কিরূপ ছিল। এ ঘটনাকে দেখো যে, যখন আমার ধ্যান হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর প্রতি যায় তো সমগ্র আত্মা তাঁর জন্যে (সাঃ) বিগলিত হয়ে দরূদে পরিণত হয়ে যায়। কেমন বিরাট পরীক্ষা! যারা আবতার (অপুত্রক) বলত, তারা চারিদিকে বিস্তৃত ছিল। প্রত্যেক শিশুর মৃত্যুর পরে 'আবতার' 'আবতার' বলে ধ্বনি উঠত। কুরআন করীম এই ঘটনাকে এভাবে

সংরক্ষণ করেছে যে, ইন্না শানেয়াকা হুয়াল আবতার (অর্থাৎ নিশ্চয় তোমার শত্রুই অপুত্রক —অনুবাদক -সূরা কাওসার : ৪ আয়াত) হে মুহাম্মদ ! (সা:) তুমি দেখবে যে, তোমার শত্রুই অপুত্রক থেকে যাবে। আর তাদের সন্তানগণই তোমার সন্তানে পরিণত হবে। কিন্তু যতটুকু পর্যন্ত ঐ সময়ের জগতের সাথে সম্পর্ক তাদের তো এসব কথা বোধগম্য ছিল না যে, আধ্যাত্মিকভাবে সমগ্র জাতিকে মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা:)-এর পদ প্রান্তে এনে জড় করে দেয়া হবে। তারা তো দেখছিল যে, একটি পুত্র মারা গেল, পুনরায় দ্বিতীয়টি হলো আবার তৃতীয়টি হলো, পুনরায় চতুর্থটি এবং প্রত্যেক বারই হাসি-ঠাট্টায় লিপ্ত হয়ে তদ্বারা তাদের ধারণায় অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে দিত এবং না মুহাম্মদ (সা:) কিছু করতে পারতেন আর না মুহাম্মদ (সা:)-এর খোদা কিছু করতে পারতেন। এখন দেখুন প্রতিটি জন্মের পর এবং প্রতিটি মৃত্যুর পর কতই না কঠোরতার সাথে এই লাঞ্ছনা তাঁর (সা:) এর অন্তরকে বিদীর্ণ করতো; কিন্তু তিনি (সা:) ধৈর্য ও সংকল্পের এক পাহাড় ছিলেন।

একটি বর্ণনায় আছে যে, এক মহিলার পুত্র মারা গেল। আর সে তার কবরের নিকট দাঁড়িয়ে খুব কষ্টদায়ক অবস্থায় কান্নাকাটি করছিল। আঁ-হযরত (সা:) তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বললেন, মাগো! ধৈর্য ধারণ করো। ঐ হতভাগীর জানাই ছিল না যে, বক্তা কে ছিল। সে বল্লো, ধৈর্য! নিজের পুত্র যদি মারা যেত তাহলে বুঝতে যে, ধৈর্য কি জিনিস। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আরামের সাথে বলে দিলেই হল যে, ধৈর্য ধরো। ধৈর্য ধরা কোন সহজ কথা নয়। আঁ-হযরত (সা:) কেবল এতটুকুই বল্লেন, মাগো! আমার এগারটি সন্তান হলো আর এগারটিই মারা গেল আর এই কথা বলে তিনি সামনে এগিয়ে চল্লেন। কেউ বল্ল, হে মুর্খ-বোকা বুড়ী! তুমি এ কি কথা বল্লে! ইনি তো মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা:)। সে দৌড়াতে দৌড়াতে পিছনে গেল এবং বল্লো, হে আল্লাহ্র রসূল (সা:)! আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি ধৈর্য ধারণ করছি। তিনি (সা:) বল্লেন, ধৈর্যের একটা সময় হয়ে থাকে, সে সময় চলে গেছে। সময় তো প্রত্যেককে ধৈর্য দিয়েই থাকে।

ধৈর্যের জন্যে মহান সফলতা থেকে কিছু না কিছু অংশ লাভ করা আবশ্যক

অতঃপর আঁ-হযরত (সা:)-এর প্রসঙ্গে আল্লাহ্তা'লা বলেছেন যে, তিনি ধৈর্যশীল তখন ধৈর্যকে সম্বোধন করে বলা হয় নি। সাধারণ মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে— ওমা ইউলাক্কাহা ইল্লাল্লাযীনা সাবারূ—ঐ মহান উদ্দেশ্যকে ধৈর্যশীলগণ ব্যতিরেকে কেউ পেতে পারে না এবং পরে দেখুন যে, আমাদের প্রভু ও অভিভাবককে কিভাবে পৃথক করে, বিশিষ্ট করে এই আয়াতের এ অংশে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, ওমা ইউলাক্কাহা ইল্লা যু হায্যেন আযীম। এ মহান উদ্দেশ্যকে সত্যিকার অর্থে যিনি পেয়েছেন তিনি হলেন, আমাদের মুহাম্মদ (সা:)। কেননা তাঁকে ধৈর্যে এক মহান সফলতা দান করা হয়েছে আর হায্যেন আযীম (মহান সফলতা) তো যদিও পুরোপুরিভাবে কোন একটি বিষয়কে বেঁধে দেয়নি

এজন্যে হায্‌যেন আয়ীমে সর্বদা পিছনের বিষয় এসে যায় যা এ আয়াতের প্রারম্ভে বর্ণিত হয়েছে এবং এদিক থেকে আমাদেরকে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আনুগত্যে না কেবল ধৈর্য শিখতে হবে বরং হায্‌যে আযীম এর অংশও লাভ করতে হবে। এর প্রথম অংশ হলো —ওয়ামান আহসানু কাওলাম্‌ মিম্মান দা'আ ইলাল্লাহে অর্থাৎ দায়ী-ইল্লাল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী) হতে চাও তো তোমাদের কথা-বার্তা উত্তম হতে হবে নচেৎ সমস্ত-কথা-বার্তা নিষ্ফল ও নিরর্থক প্রমাণিত হবে। সারা জীবন কথা-বার্তা বলে কাটিয়ে দেবে এর মধ্যে সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সৃষ্টি হবে না। হ্যাঁ, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী হও তা হলে তোমাদের কথা খুবই উত্তম। কথা বলতে হয় তো ইহা করো—ওয়া আমেলা সালেহান—কেবল আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করলেই হয় না পুণ্য কর্ম করে দেখাও যেন ইহা পরিস্ফুট হয় যে, যার দিকে আহ্বান করতে এসেছে তাঁর সাথে তোমদের সম্পর্ক আছে। যদি আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে তোমাদের কর্মে পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হতে হবে। তোমাদের মধ্যে আকর্ষণী শক্তি থাকা বাঞ্ছনীয়। তোমাদের মধ্যে দিনের পর দিন পরিবর্তনসমূহ সুপ্রকাশিত হতে থাকা উচিত। কেননা খোদাতা'লা সীমাহীন আর তাঁর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টিকারী কখনো একই স্থানে অবস্থান করতে থাকে না। তাঁর জীবন খোদার দিকে ধারাবাহিক ভ্রমণস্বরূপ। আর কখনও কোন অবস্থায় আপনি বলতে পারেন না যে, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক সৃষ্টিকারী ব্যক্তি তার ভ্রমণকে সম্পূর্ণ করেছেন। সুতরাং এ বিষয়বস্তুই আয়াতে করীমায় বর্ণিত হয়েছে এবং পরে সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে যে, ওমা ইউলাক্কাহা ইল্লা যু হায্‌যেন আযীম। এ বিষয়-বস্তুকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্বীয় মর্যাদার চরমত্বে পৌঁছিয়েছেন এবং তিনি প্রত্যেক ঐ গুণ থেকে বড় অংশ লাভ করেছেন যে গুণ আয়াতে করীমার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। পুনরায় বলা হয়েছে—ইদফা' বিল্লাতী হিয়া আহসানু—যে বস্তু উত্তম উহা দ্বারা খারাপ বস্তুগুলোকে প্রতিহত করো। অর্থাৎ যখনই কেউ তোমার সাথে খারাপ আচরণ করে তখন তুমি তার বদলে উত্তম আচরণ দেখাও এবং পুণ্যের কথা-বার্তা বলো। তবলীগে প্রত্যহ মানুষকে এ বিষয়ের মোকাবেলা করতে হয় আর মানুষকে প্রত্যহ এরূপ শত্রুদের কথা-বার্তা শুনতে হয় যাদেরকে প্রেম-প্রীতির মাধ্যমে সত্যের দিকে আহ্বান করা হয়। কিন্তু তারা এর বদলে বৃথা কথা-বার্তা বলে, কঠোর ভাষা ব্যবহার করে, ঠাট্টা মস্করা করে, এবং যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে শক্তি ও কঠোরতার সাথে ব্যবহার করে এমনকি হত্যা করার জন্যেও প্রস্তুত হয়ে যায়। প্রত্যেক লোক যে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানের কাজ করে তাকে জীবনের বিভিন্ন অংশে এ ধরনের মোকাবেলা করেই পথ চলতে হয়। আল্লাহ্‌ বলেছেন, স্মরণ রেখো! ইদফা' বিল্লাতী হিয়া আহসানু—অর্থাৎ উত্তম কথা দ্বারা প্রতিহত করো। এখানে তো সাইয়েয়াত (মন্দ) শব্দ নেই কিন্তু অন্য আয়াতে করীমায় সাইয়েয়াত-এর সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এখানে কতক কথা জ্ঞাতসারেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

এতে বিষয়-বস্তুতে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়। যখনই তবলীগ করতে বের হও উত্তম কথা অন্বেষণ করো। দলীলের মধ্যেও উত্তম দলীল বেছে নাও। ঐ পদ্ধতিই অবলম্বন করো যা সবচে' উত্তম দৃষ্ট হয়। যার মধ্যে আকর্ষণী শক্তি পাওয়া যায়। আর যখন খারাবি দেখ তখন উহাকে উত্তম আচরণ দ্বারা দূর করতে চেষ্টা করো। তোমাদের মধ্যে যদি এ সকল গুণের সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে তোমরা শত্রুকে বন্ধুতে বদলিয়ে দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। আর আল্লাহ্ বলেছেন, যে মোমেন ধৈর্য ধারণ করে তার মধ্যে অবশ্যই এ সব গুণ পাওয়া যায় এবং তার উদ্দেশ্যাবলী সাধিত হয়। কিন্তু এসব সৌন্দর্যের মধ্যে সবচে' শান ও মর্যাদাপূর্ণ অংশ যদি কারও সৌভাগ্য লাভ হয়ে থাকে তাহলে তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)। তিনি যুহায্যেন আযীম ছিলেন। খারাবির জবাব তিনি উত্তম ভাবে দিতেন এবং উপযুক্ত কথার জন্যে অধিকতর উত্তম কথা নির্বাচন করার দিক থেকে তাঁর (সাঃ) চেয়ে উৎকৃষ্টতর লোক দুনিয়াতে কখনও জন্ম হয় নি। আঁহযরত (সাঃ)-এর উপদেশাবলী হাদীসে পাঠ করুন। তাঁর আকর্ষণকারী বর্ণনাগুলোর প্রতি দেখলে অন্তর খুশীতে ভরপুর হয়ে উঠে। ১৪০০ বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে যখন ঐ কথাগুলো বলা হয়েছিল কিন্তু আজও ঐগুলো অম্লান রয়েছে। ঐ সাদাসিদে কথা আশ্চর্য চমক ও এরূপ শান ও মর্যাদা রাখে যে চোখকে ঝলসিয়ে দেয়। এরূপ আকর্ষণ রাখে যে, স্বাভাবিকভাবেই এর দিকে টেনে নিয়ে যায়।

বন্ধু ও শত্রু সবারই সাথে তবলীগি সম্পর্ক রাখুন

অতঃপর এই উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, যখন তোমরা তবলীগের মাঠে বের হও তো ধৈর্য ধারণ করো। ধৈর্য ব্যতিরেকে তো চলতেই পারবে না। বরং ইহা ছাড়া এক পা সামনে দিবে না। আর তাঁর অনুসরণ করো যাঁকে হায্যে আযীম দান করা হয়েছিল। যাঁকে তবলীগের প্রতিটি মর্যাদা স্বীয় পূর্ণ ঊর্ধ্বারোহণের সাথে দান করা হয়েছিল। অতএব আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আদর্শের ওপর যদি চলতে হয় তাহলে প্রথম কথা ইহা স্মরণ রাখুন যে, ছোট বড় প্রত্যেক রকমের লোকের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে যদিও বা বাহ্যতঃ কোমল আচরণের হোক বা কর্কশ আচরণের হোক। বড় থেকে বড় শত্রুও যদি হয় তাহলে তার নিকটও তবলীগ পৌঁছান দরকার এবং বিনা ভীতিতে তার নিকট তবলীগ পৌঁছানো দরকার। এ কথা স্মরণ রেখে তাকে তবলীগ করা উচিত যে, আঁ-হযরত (সাঃ) বড় থেকে বড় ব্যক্তির নিকটও সত্য কথা পৌঁছাতেন এবং নির্ভীকভাবে পৌঁছাতেন। আঁ হযরত (সাঃ)-এর বিদ্বেষীদের মধ্যে আবুজাহল শীর্ষস্থানীয় বিদ্বেষী হিসেবে পরিচিত। যখনই আঁ হযরত (সাঃ)-এর শত্রুদের কথা ওঠে তখন আবুজাহলের নাম সর্বপ্রথম মনে আসে এবং ইসলামী দুনিয়ার অন্য আর কোন শত্রুর নাম বিখ্যাত হোক বা না হোক কিন্তু ইসলামী দুনিয়ার পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত শত্রুর এক নাম এরূপ আছে যার নাম প্রতিটি মুসলমান অবাহত

আর ঐ নামটি হলো আবু জাহলের। যদিও এরূপ কঠোর বিদ্বেষী ছিল আবুজাহল তবু একবার এক ব্যক্তি একটি আবেদন নিয়ে আঁ হযরত (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলো। আর বল্‌লো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আবু জাহল আমার কাছ থেকে কিছু ধার নিয়েছিল কিন্তু সে দিচ্ছে না। তিনি (সাঃ) হিলফুল ফুযুল কায়েম করেছিলেন। তিনি এক সময়ে শপথ করেছিলেন যে, যখনই কোন গরীব এবং নিরুপায় লোকের সাহায্যের প্রয়োজন হবে তিনি (সাঃ) এগিয়ে আসবেন। আমি ঐ হিলফুল ফুযুলের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। আসুন এবং আমাদের সাহায্য করুন। একটি কথাও না বলে, কোন সন্দেহ পোষণ না করে আঁ হযরত (সাঃ) উঠে তাকে নিয়ে সেখানে রওয়ানা হলেন যেখানে আবু জাহল সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, সে কোথায় কোথায় বৈঠক করতে থাকে হয়ত সে সেখানে বসা আছে। অতএব তিনি (সাঃ) উঠে ঐ বৈঠকের দিকে রওয়ানা দিলেন এবং গিয়ে সোজা আবু জাহলকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন, হে অমুক! এ ব্যক্তির কাছে তুমি এত টাকা ঋণী। টাল বাহানা করে বহু দিন চলে গেছে এখন ইহা আদায় করো। আর সে বিনা আপত্তিতে, বিনা বিরোধিতায়, বিনা বাহানায় ঐ সময়ই উদ্দিষ্ট টাকা আদায় করার জন্যে (তার লোকদেরকে) আদেশ দিয়ে দিলো। যখন আঁ হযরত (সাঃ) সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। তখন তার সঙ্গীরা তাকে ধিক্কার দিল, তাকে লাঞ্ছিত করলো (এই বলে) যে, 'তুমি কি প্রকারের শত্রু। ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তুমি আমাদের এমন-ভাবে ক্ষিপ্ত করো যেন (প্রাণে) আগুন লাগিয়ে দাও। আজ সে আসল আর তোমার সাথে একটি কথা বল্লো কিন্তু তোমার সামর্থ্য ছিল না যে, তাকে অস্বীকার করতে পারো'। তুমি তার বাধ্য দাসের মত তার কথার ওপর কাজ করে দিলে। আবুজাহল বল্লো, তোমরা তা দেখনি যা আমি দেখেছি। স্বাভাবিক অবস্থা হলে আমি ঐ ব্যক্তির সাথে সেই ব্যবহারই করতাম যা আমি সর্বদা করে থাকি। কিন্তু যখন সে আমার সাথে কথা বলছিল যে, ঐ ব্যক্তির পাওনা আদায় করো তখন আমার অন্তরে বিদ্রোহের আবেগ উদ্দীপ্ত হচ্ছিল তো ঐ সময় আমি দেখছিলাম যে, যেন দু'টি পাগল উট আমার উপর আক্রমণ করার জন্যে প্রস্তুত। ওদের মুখ থেকে (রাগে) ফেনা ঝরছিল। যদি আমি অস্বীকার করতাম তাহলে আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল যে, ঐ উটগুলো আমার ওপর লাফিয়ে পড়বে। এ কোন্ ঘটনা ঘটল? খোদাতা'লার নিকট থেকে সমর্থনের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে আর যার কারণে তিনি স্বীয় দাসদের পক্ষে নিদর্শন দেখান ইহা তার একটি দৃষ্টান্ত ছিল। আবু জাহলের মত শত্রুর সাথে যে খারাপ সম্পর্ক ছিল তথাপি আঁ হযরত (সাঃ) খোদার উদ্দেশ্যে, প্রতিশ্রুতি রক্ষার খাতিরে সর্বপ্রকার দৈহিক ও প্রাণের ক্ষতি উপেক্ষা করে তার নিকট গিয়েছিলেন। আল্লাহ্ ইহার এমন কদর করলেন যে, দিব্য-দর্শনে আবু জাহলকে দু'টি উট দেখিয়ে দিলেন যা উন্মত্ত ছিল আর ওদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, আক্রমণ করার জন্যে প্রস্তুত। এ বিষয় অবহিত হওয়া যায় যে, কাশ্‌ফ (দিব্য-দর্শন) ও ইলহাম বিভিন্ন অবস্থায় হয়ে থাকে। আর

কতক কাশ্‌ফ আনুকূল্যে হয়ে থাকে। পাপ ও পুণ্যের বৈশিষ্ট্য কাশ্‌ফ ও ইলহামের অবস্থানুযায়ী অবহিত হওয়া যায়। অতএব আবু জাহলের যে কাশ্‌ফ ছিল ইহা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সমর্থনেই ছিল কিন্তু দেখানো হয়েছিল আবু জাহলকে। কিন্তু এই কথা ঐ সময়ে প্রকাশিত হয় যখন কোন খোদার বান্দা খোদার জন্যে সর্বপ্রকার কুরবানী করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় আর বাহ্যতঃ নিজের ক্ষতির উপকরণ নিজের হাতে করে নেয়। এমন এক শত্রুর নিকট নির্ভয়ে চলে যাওয়া এরূপ কথা যে, যেন বাঘের গর্তে মানুষ প্রবেশ করে। আমরা দেখি যে, আঁ হযরত (সাঃ) কাউকে সাথে না নিয়ে, কোন রক্ষীকে সাথে না নিয়ে রওয়ানা দিলেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর এ আহ্বানের কদর করলেন। এজন্যে তাঁকে রক্ষা করলেন। অতএব ইহা ঐ মহান অংশ যা হযরত রসূল করীম (সাঃ) প্রতিটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে লাভ করেছিলেন। আর আপনাদেরও প্রতিটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কিছু না কিছু অংশ আঁ হযরত (সাঃ) থেকে নিতে হবে। আঁ হযরত (সাঃ) তো প্রতিটি আচরণ থেকে এক মহান অংশ নিয়ে নিয়েছেন কিন্তু যতটুকু অংশ রেখে গেছেন তাও এত যে, সমগ্র মুসলমানদের মধ্যে যদি বিতরণ করা যায় তাহলেও তা শেষ হবার নয়। আর যে অংশ আঁ হযরত (সাঃ) নিজের করে নিয়েছেন আসলে আপনাদের অংশ তো তাই-ই। মহান আচরণ থেকে তিনি যা নিজের করে নিয়েছেন তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা জরুরী।

আমি এখনই এই কথা বলছি যে, যে অংশ ছেড়ে গিয়েছেন তাই-ই যদি মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হয় তবুও তা শেষ হবে না। এ কথা এমনই যে, অধিকাংশ লোক শুনামাত্রই বুঝবে না, তাই কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হবে। আঁ হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে জানা যায় যে, তাঁকে উত্তম চরিত্রের সাথে সফলতা দান করা হয়েছিল। চরিত্রের বিভিন্ন প্রকার ভেদ রয়েছে। কতকগুলো প্রকার রয়েছে ছোট ছোট। কিছু কিছু খুব উন্নত ধরনের প্রকার ভেদ রয়েছে। অতএব আঁ-হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে যখন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন যে, তিনি (সাঃ) অংশ নিয়ে নিচ্ছেন তখন এ সন্দেহও সৃষ্টি হয় যে, চরিত্রের কোন কোন দিক হয়ত তিনি (সাঃ) ছেড়েও দিয়ে থাকবেন আর কতক নিয়ে থাকবেন। এর ব্যাখ্যাও খুবই জরুরী। উদ্দেশ্য অবশ্যই ইহা নয়। উদ্দেশ্য এই যে, সত্যবাদিতা থেকে ঐ অংশ নিয়ে ছিলেন যা সবচে' উত্তম অংশ ছিল আর উহা আয়ত্বাধীন করা খুবই কঠিন কাজ ছিল। লজ্জাশীলতা থেকে ঐ অংশ নিয়েছিলেন যা সবচে' উত্তম অংশ ছিল আর যা অবলম্বন করা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। নিজের চেয়ে অন্যের প্রয়োজনকে বড় করে দেখার মধ্যে তিনি এরূপ অংশ নিয়েছেন যে, ইতিপূর্বে কারও ভাগ্যে তা হয়নি। ধৈর্য থেকে তিনি এরূপ অংশ নিয়েছেন যার আর কোন দৃষ্টান্ত দুনিয়াতে দেখাই যায় না। তাই হায়্‌যে আযীম বলে ইহা বলা হয়নি যে, কোন্ কোন্ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তিনি

পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন। কিছু অবলম্বন করেছিলেন আর কিছু ছেড়ে দিয়েছিলেন। হায্‌যে আযীমের মধ্যে 'আযীম' শব্দটি বলে যে, সবচে' উত্তম আর সবচে' মর্যাদাপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তো তিনি নিজের করে নিয়েছিলেন আর যা ছেড়ে দিয়েছিলেন তা সাধারণ লোকদেরকে মর্যাদাবান করার জন্যে যথেষ্ট। ঐ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী এমনই যে, যেগুলোকে কেউ যদি সাধারণভাবে অবলম্বন করে তাহলে এর বদৌলতে সে উত্তম চরিত্রের মানুষ বলে দুনিয়াতে পরিচিত হবে। অতএব একথা তো যথার্থই যে, অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীও যদি মুসলমানগণ নিজেদের আয়ত্বাধীন করে নেয় তবে তারাও ইল্লাল্লাযীনা সাবারূ-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের ওপর ন্যস্ত যে কাজ তা বড়ই মহৎ। এজন্যে আমাদের সাধারণ চারিত্রিক গুণাবলী থেকে উন্নতি করে ঐ অংশ যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের জন্যে বেছে নিয়েছেন তার মধ্য থেকেও কিছু নিজের জন্যে অবলম্বন করা উচিত। ইহা ঐ বিষয় এগুলো যদি আপনারা ভালভাবে বুঝতে পারেন তাহলে আপনাদের দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজ কঠিন হওয়ার বদলে সহজ হয়ে যাবে, কষ্টদায়ক হওয়ার পরিবর্তে এক আরামপ্রদ অবস্থায় বদলে যাবে। সারা জীবন আপনি এ কাজে নিয়োজিত থাকুন কখনও আপনি থামবেন না। কেননা আঁ-হযরত (সাঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত এ কাজ করা থেকে বিরত হন নি। আপনার এ পথে কষ্ট বরণ করার ফলে আপনি শান্তি পাবেন। কেননা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এরূপ কষ্টে শান্তি লাভ হত যা তিনি এ পথে বরণ করতেন।

হায্‌যে আযীম থেকে অংশ না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের কাজ সহজসাধ্য হবে না

অতএব হায্‌যে আযীম-এর প্রতি দৃষ্টি দিন। আমাদের স্কন্ধে যে কাজ ন্যস্ত করা হয়েছে তা এত বড় আর এত কষ্টসাধ্য যে, উহা ব্যতিরেকে এ কষ্টসাধ্য কাজ আমাদের জন্যে সহজসাধ্য হবে না। এ পর্যন্ত আমি যা দেখেছি তা এই যে, খুব কম লোকই আছে যারা পূর্ণ গাম্ভীর্যতার সাথে এর প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। আর জামাতসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক এরূপ যে, তারা আবেগ তো রাখেন কিন্তু তাদেরকে তাদের নেযাম না তো বিনা ব্যতিক্রমে শিশুদের ন্যায় তরবীয়ত দিতে গিয়ে নিজের মত করেছেন আর পন্থা-পদ্ধতি লিখিয়েছেন যে, কিভাবে তবলীগ করতে হয় আর না তাদের মধ্যে এই যোগ্যতা আছে যে, আজ তারা নিজেরাই দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজ করতে পারে। অতএব বহু লোক এরূপ আছেন যারা দাঈয়ান ইলাল্লাহ্ হতে পারতেন কিন্তু হতে পারেন নি। এ পর্যায়ে ইনশাআল্লাহ্ আগামী শুক্রবার আমীরদেরকে নসীহত করবো। ইহা ব্যক্তিগত পর্যায়ের নসীহত যা জমাতের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখে। কিন্তু বহু লোক এরূপ আছেন যে, যারা নসীহত শুনেন, নসীহতের ওপরে আমল করতে চান কিন্তু করতে পারেন না। তাদের জন্যে মুরব্বীর প্রয়োজন আর মুরব্বীদের জন্যে বিনা ব্যতিক্রমে একটি সংগঠনের দরকার। নিয়মানুযায়ী সংগঠনের অনুগত এমন মুরব্বী হোক যারা ঐ সকল বান্দাগণ পর্যন্ত পৌঁছাবেন, তাদের তরবীয়ত করবেন, তাদের সাধারণ অবস্থা থেকে উচ্চতম মাকামে পৌঁছাবেন,

অতঃপর উভয় দিক থেকে তত্ত্বাবধান করতে হবে। কতক আহমদী আছেন যারা খুতবা শুনে তখন তখনই দায়ী ইলাল্লাহ্ হয়ে গেছেন। কতজন এমন আছেন যাদের মধ্যে আকাঙ্খাসমূহ সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সময়ের সাথে আস্তে আস্তে শৈথিল্য এসে যায়। কতক জামাত এমন আছে যেখানে তবলীগের ফলে প্রকাশ্যভাবে বহু লোক মুসলমান হওয়া আরম্ভ করেছে। কতক স্থান এমন রয়েছে যেখানে তীব্র বেগে তবলীগ হচ্ছে কিন্তু কোন প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে না। যদি আপনি জামাতগুলোর অবস্থা—পর্যায়ক্রমে ভাগ করা শুরু করেন তাহলে আপনি এমন সব দল পাবেন যাদের প্রতি জামাতের সংগঠনের বিনা ব্যতিক্রমে দৃষ্টি দিতে হবে। যদি তা না করা হয় তাহলে সেগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। তাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে ঐ যোগ্যতা নেই যে, তারা তাদের পুণ্যকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে। সুতরাং বহু কাজ এরূপ আছে যা জামাতের সংগঠনকে করতে হবে। বহু কাজ এমন আছে যা ব্যক্তিগত পর্যায়ের। কিন্তু জামাতের আমীরের দায়িত্বে ইহা ন্যস্ত যে, তিনি দৃষ্টি রাখবেন যে, কত লোক এরূপ আছে যারা এ ব্যক্তিগত পর্যায়ের কর্মসূচী থেকে উপকৃত হচ্ছে। যদি তারা একবার বলেই অমনোযোগী হয়ে যায় তাহলে তিনি তার এমারতের দায়িত্ব পালন করলেন না। কেননা তার জন্যে ধৈর্যের বিষয় রয়েছে। আর নসীহতকারীকে সবচে' বেশী ধৈর্য থেকে অংশ নেয়া দরকার। এ বিষয়ও আমি এ আয়াতে করীমাগুলো থেকে শিখেছি। কেননা আঁ-হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে এ কথা বলা হয়েছে যে, তিনি হাযমে আযীম সম্পন্ন মানুষ। তাই প্রথমে ধৈর্যশীলদের কথা বলে দিয়েছিলেন। এর মধ্যে একটি গুঢ়তত্ত্ব আছে আর উহা এই যে, তিনি ধৈর্যশীল সৃষ্টিকারী। তিনি স্বীয় সাথীদেকে এরূপ ধৈর্যশীলরূপে গঠন করে দিয়েছেন যে, খোদা বহু প্রীতির সাথে তাদেরকে স্মরণ করেছেন। তিনি নিজে কত বড় ধৈর্যশীল! আর ঘটনা এই যে, যে স্বয়ং ধৈর্যশীল হয় সে-ই অন্যকে ধৈর্যশীল বানাতে পারে। যার নিজের মধ্যে ধৈর্য নেই সে অন্যকে ধৈর্যের জন্যে উপদেশ দিতে পারে না। এজন্যেই বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর ধৈর্যের পরিমাপ করো। তিনি (সাঃ) ধৈর্যের কত বড় অংশই না পেয়ে থাকবেন! ইল্লাল্লাযীনা আমানূ—যত ঈমানদার ধৈর্যশীল তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইহা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর চেষ্টারই ফল। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কল্যাণের ফল ইহাই যে, এত ধৈর্যশীলগণের সৃষ্টি হয়েছে। অতএব তোমরাও মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর দ্বার থেকে ধৈর্য ভিক্ষা করো। তখন তোমরা দেখবে যে, তোমাদের মধ্যে মহাপরিবর্তন সাধনের শক্তি দেয়া হবে। আর তোমরা বাস্তবিকই ঐ কাজ করে দেখাবে যা বাহ্যতঃ অসম্ভব বলে দেখা যাচ্ছিল। সুতরাং ফ্রান্স হোক, জর্মানী হোক অথবা হল্যাণ্ড হোক বা দুনিয়ার যে কোন দেশই হোক—প্রত্যেক দেশই মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এরই দেশ। কেননা তাঁকে রহমাতুল্লিল আলামীন (সমগ্র জগতের কল্যাণ—অনুবাদক) করে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রত্যেক দেশের জামা'তের সদস্যগণের প্রথম কর্তব্য এই যে, তারা যে দেশের অধিবাসী, যে দেশের নিমক খান, যে দেশের পানি পান করেন ঐ দেশের অধিবাসীদের প্রতি পরিপূর্ণ দৃষ্টি দেন তাদের মধ্যে নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে যোগ্য লোকদের বাছাই করেন; হোক না তারা শত্রুতায় অগ্রগামী; যদি তারা সাহস ও ধৈর্য এবং মুহাম্মদী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা তবলীগ করে তাহলে আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলছি যে, ঐসব শত্রুদের মধ্য থেকে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ধর্মের জন্যে প্রাণ উৎসর্গকারী বন্ধু সৃষ্টি হয়ে যাবে। খোদা করুন ফ্রান্স জামা'তের জন্যে ফ্রান্সে আর অন্যান্য দেশগুলোর জন্যে অন্যান্য দেশে এই আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হোক।

(মাসিক আখবারে আহমদীয়া, জার্মানী-এর আগষ্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যার সৌজন্যে)

২৩শে মার্চের গোড়ার কথা

—আলহাজ্জ এ, টি, চৌধুরী

১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বয়াত গ্রহণের জন্য ঐশী নির্দেশ পান। এই নির্দেশ মোতাবেক লুধিয়ানা শহরের নয়ী মহল্লায় আহমদ জান নামক জনৈক ভক্তের গৃহে ১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চ হযরত আহমদ (আঃ) বয়াত গ্রহণের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জমাতের ভিত্তি স্থাপন করেন। ঐ দিন ৪০ জন লোক দীক্ষা গ্রহণ করেন।

লুধিয়ানা শহরটি লুধি-রাজ বংশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। হাদীসে ছিল প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) বাবে লুদে দাজ্জালকে বধ করবেন। ১৮৩৪ সালে লুধিয়ানা শহরে সর্বপ্রথম প্রেজবিটেরিয়ান খৃষ্টানরা দাজ্জালী প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করে (History of Protestant Missions in India : Page-218) আর এর কয়েক মাস পরই শেষ যুগের ত্রাণকর্তা ইমাম মাহদী (আঃ) ১৮৩৫ সালে কাদিয়ান নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। খৃষ্টানদের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে, মসীহ মার্চ মাসেই আবির্ভূত হবেন (Religion in the United States by Benson Y. Landis)

পাঞ্জাবের লুধিয়ানা শহরের এক পাশে এক অখ্যাত মহল্লার একটি গৃহে মাত্র চল্লিশ জন লোক নিয়ে যে জমাতের যাত্রা শুরু হল, আজ তা পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের ১৩০টি দেশে প্রায় পাঁচ হাজার স্থানে বিস্তার লাভ করেছে। শত বাঁধা, শত প্রতিবন্ধকতা এই জামাতের অগ্রযাত্রাকে রুদ্ধ করতে পারে নি। যুগের ইবলিস, ফেরাউন, হামান, কংশ, শিশুপাল, নমরুদ, ফরিশি, আবুজাহল, আবুলাহাব এবং শাদ্দাদেরা শার্দূল আর নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে বার বার এই ঐশী পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিতে। কিন্তু না, কোন শক্তিই আহমদী জমাতের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারে নি। বরং যারা ব্যর্থ করতে চেয়েছিল তারাই ব্যর্থ হয়ে বিদায় নিয়েছে এই ধরাধাম থেকে। অপর দিকে আহমদী মুসলিম জমাত আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। এক দেশে নয় বহু দেশে আহমদীয়া জমাত আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম ধর্মনিরপেক্ষ সব রকম মানুষের দেশেই আজ আহমদীয়াতের বাণী ছড়িয়ে গেছে। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে আহমদী মুসলমানদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিতে পারলেও বিশ্বের সকল দেশের আহমদীরা মোল্লা-মৌলবীদের নাগালের বাইরে। আইন করে মোল্লা রাষ্ট্র পাকিস্তানে আযান বন্ধ করা হয়েছে। কলেমা পাঠ করার অপরাধে (!) আহমদীদেরকে জেল দেয়া হয়েছে। আহমদী জামা'তের খলীফার খুতবা, ভাষণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। খলীফাতুল মসীহকে (আইঃ) হিজরত করতে হয়েছে মোল্লা রাষ্ট্র পাকিস্তান থেকে। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের ক্ষমতাতো সীমাবদ্ধ। পাকিস্তান

রাষ্ট্রের বর্ডার পার হলেই আহমদীরা প্রাণ ভরে আযান ধ্বনি দিতে পারে। ১৯৯১ সালে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হয় শতবর্ষ পূর্তি সালানা জলসা। পাকিস্তান থেকে এসেছিল কয়েক হাজার আহমদী মুসলমান। শুনেছি, বর্ডার পার হয়েই তারা মুক্ত বিহঙ্গের মত স্বাধীন ভাবে নিঃশ্বাস নিয়েছে। উচ্চ কণ্ঠে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়েছে। ওপার থেকে পাকিস্তানী পুলিশ তা অসহায়ের মত তাকিয়ে দেখেছে। কোন 'লং মার্চ' এই আন্তর্জাতিক সীমা রেখা লঙ্ঘন করতে পারে না। শত শ্লোগান আছড়ে পড়ে ঐ সীমান্তের প্রাচীরের গায়। পাকিস্তানের আকাশেও জঁাদরেল জিয়াউল হকের আইন কার্যকর নয়। যে আকাশের নীলিমায় জিয়াউল হকের অস্তিত্ব মিলিয়ে গেছে সেই অনন্ত আকাশের মধ্য দিয়ে ভেসে আসছে আহমদী জামা'তের খলীফার কণ্ঠস্বর খুতবা, বাণী। ভেসে আসছে তাঁর জীবন্ত ছবি। প্রদর্শিত হচ্ছে ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদের (আঃ) চিত্র। ডিস এন্টিনার মাধ্যমে ঘরে ঘরে এই ছবি দেখেছে পাঁচটি মহাদেশের বহু মানুষ। আহমদীয়া মুসলিম টি, ভি, এর মাধ্যমে আযান ধ্বনি প্রচারিত হচ্ছে পাকিস্তানের কোণে কোণে। না, পাকিস্তানের কালো আইন এই আকাশবাণীকে বাঁধা দিতে পারছে না। ওখানকার অসহায় মৌলবীরা তাই সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে ডিস্ এন্টিনা বন্ধ করে দেবার জন্য। কিন্তু না, সেই আবেদন গ্রাহ্য হয় নি। হবেও না। কারণ আহমদী জামা'তের খলীফার বাণী বন্ধ করতে হলে বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে বিশেষ করে এই প্রচার মাধ্যমে। তাই মৌলবাদীদের দাবী পাকিস্তান সরকার গ্রহণ করতে পারে নি। বিগত ২৩শে মার্চ ছিল ইংল্যাণ্ডে ২৯শে রমযান। আহমদী জামা'তের খলীফা ঐ দিন পবিত্র কুরআনের শেষ চারিটি সূরার দরস দিয়েছেন। সব শেষে ইফতারের পূর্বে ইজতেমায়ী দোয়া করেছেন তিনি পাঁচটি মহাদেশের আহমদীদেরকে নিয়ে। কী অপূর্ব,অভূতপূর্ব দৃশ্য! লণ্ডনে বসে হাত উঠিয়েছেন বিশ্ব নেতা খলীফা আর অগণিত ভক্তের হাত উঠেছে আল্লাহ্‌র দরবারে দুনিয়ার নানা দেশ থেকে। টি, ভি, তে প্রচারিত হচ্ছে জীবন্ত এই দৃশ্য! পৃথিবী সৃষ্টি অবধি এমনটি আর কখনও দেখা যায়নি।

মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন যে, ইমাম মাহদী (আঃ) যখন আবির্ভূত হবেন তখন তিনি যুদ্ধ রহিত করবেন। কারণ যুদ্ধ করে কখনও শান্তি স্থাপন সম্ভব নয়। মুসলমানরা এ যুগে অস্ত্রের উপর ভরসা করে শুধু ক্ষতিগ্রস্থই হবে। অস্ত্রবলে কখনও মুসলমানরা জয়যুক্ত হবে না।

আহমদী জমাতের প্রতিষ্ঠাতা বলেন, ইসলামের বিজয় অস্ত্রের দ্বারা নয় কলমের দ্বারা সাধিত হবে। বিশ্বের মুসলমানরা এই সত্যকে বুঝতে না পারলে তাদেরকে আরো বহু কষ্ট স্বীকার করতে হবে। রক্ত ঝরাতে হবে দুশমনের সৃষ্ট ও ব্যবহৃত মারণাস্ত্রের আঘাতে।

মসীহে মাওউদ (আঃ) ২৩শে মার্চ তাঁর জমাতের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর

সত্যতা প্রমাণ করে ১৮৯৪ সালের মার্চ মাসে প্রতিশ্রুত সূর্য গ্রহণ হয়। মার্চ মাস (Mars) দেবতার নামে পরিচিত। রোমানদের রণ দেবতা মার্সের পূজার জন্য মার্চ মাসের ২৩ তারিখ নির্দ্ধারিত ছিল। আর এই যুদ্ধ-দেবতার পূজার দিনেই মসীহে মাওউদ (আঃ) যুদ্ধ রহিত করার জন্য এক আধ্যাত্মিক বাহিনীর প্রতিষ্ঠা করলেন। Encyclopaedia Britannica, Vol. 14 এর ৯৫৭ পৃষ্ঠায় আছে, Tubilustrium a Purification of the war trumpets, occoured on March 23, All these have a connection with the initiation of the war season.

প্রখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ তারিখে খামিসে বর্ণিত হয়েছে যে, ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ২৩শে মার্চ তারিখে। এই যুদ্ধে মুসলমানদেরকে পরাজয় বরণ করতে হয়। যুদ্ধ দেবতার জন্য বিশেষ দিন 'তুবিলাসত্রিয়াম' উদযাপনের তারিখ ২৩শে মার্চ এবং ওহুদের যুদ্ধে পরাজয় বরণের দিন ২৩শে মার্চে আল্লাহ্‌তা'লা যুদ্ধকে রহিত ঘোষণাকারীর জমাতকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর তাই খৃষ্টানরা যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করছিল মুক্তির দূত মসীহের জন্য এই মার্চ মাসেই। আর আল্লাতা'লা এই মার্চ মাসেই আকাশে সূর্য গ্রহণ ঘটিয়ে তাঁর প্রেরিত পুরুষের সত্যতার সাক্ষী প্রদান করেন। আহমদী জমাত মার্চ মাসের নামকরণ করেছে আমান। আমান অর্থ—শান্তি, নিরাপত্তা। তাই এখন ২৩শে মার্চ হল 'বিশ্ব যুদ্ধ মুক্ত দিবস'। আহমদীয়াতের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান হবে। বিশ্বব্যাপী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলেই চিরতরে যুদ্ধের অবসান হবে।

(৩২ পৃঃ পর)

সংবিধানের ৫ম সংশোধনীতে গণতান্ত্রিক আদর্শের পশ্চাদাপসরণের প্রথম পদক্ষেপ; ৯ম সংশোধনীতে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় পদক্ষেপ।

এবারের একুশের মৌসুমে সারাদেশে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে মৌলবাদের বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, ঘাতক-দালালদের সমূলে উৎখাত করার সংকল্পে। এই আন্দোলন এখন রয়েছে মধ্য পথে। এই আন্দোলনের সংগে যুক্ত হওয়া উচিত সংবিধানের ৮ম ও ৯ম সংশোধনী বিলোপ করে, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সাংবিধানিক ভিত্তিটাকে পুনর্বার সুসংহত করে নেয়া এছাড়া আন্দোলনের জন্য যে আদর্শিক কাঠামোর প্রয়োজন, সেখানে শূন্যতা থেকে যাবে"।

(দৈনিক ভোরের কাগজের ২১-২-৯৩ তারিখের সংখ্যার জন্যে)

ধর্মান্ধতা ঃ একুশের চেতনায়

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

"সারা ভারতে সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিয়েছে আশঙ্কাজনক মাত্রায়। এতদিন পর কেন এই ঘুমন্ত দৈত্যটা জেগে উঠল, এই নিদ্রাভঙ্গ কি স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটেছে, না কি কোন অশুভ শক্তি এটা ঘটিয়েছে, ইত্যাকার প্রশ্ন আজ আমাদের সকলের মনে। ইদানিং সাম্প্রদায়িকতার যে রূপ আমরা দেখলাম, অতীতের সঙ্গে তার একটি বিষয়ে মৌলিক প্রভেদ আছে। অতীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চিন্তা প্রশ্রয় পেয়েছে। যেমন অবিভক্ত ভারতে মুসলমানদের মধ্যে। শক্তিমানের দাপট দুর্বলের অস্তিত্ব বিপন্ন করবে, এই চিন্তাটাই মনে হয় সেদিন কার্যকর ছিল বেশী। আবার অবিভক্ত বাংলাদেশে, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তার রাজনৈতিক কর্মধারা ছিল সংখ্যালঘু—মনোভাবাপন্ন। এর কারণ ছিল মুসলমানের সামাজিক হীনাবস্থা। হিন্দু জমিদার, মুসলমান রায়ত; হিন্দু মহাজন, মুসলমান অধমর্ণ। সামাজিক বিন্যাসে মুসলমানের এই অবস্থান তার রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। সামগ্রিকভাবে যখন একটা সমাজ দুর্দশাগ্রস্ত তখন তার মধ্যে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেখা দেবে, যেহেতু সে নিজেকে বিপন্ন ভাববে, যেহেতু তার সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে তার মনে থাকবে একটা উদ্বেগ, একটা অনিশ্চয়তার বোধ।

এই সাম্প্রদায়িক চেতনাই কাজ করেছিল সাতচল্লিশে, ভারত বিভক্তির পিছনে। কিন্তু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হওয়ার পর কি হল? উগ্র সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ও তিক্ততা কিছুটা কমল, কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান হ'ল না। ভারত ও পাকিস্তান,—দু'টি দেশেই রয়ে গেল বিস্তর সংখ্যায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। তাছাড়া, এমন একটা সুস্থ রাজনীতির ধারা গড়ে উঠল না যার ফলে মানুষের ধর্মীয় পরিচয়টা তুচ্ছ হয়ে যায়, তার নাগরিক পরিচয়টাই মুখ্য হয়ে ওঠে। ভারতীয় সংবিধানে অবশ্য শুরু থেকেই সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল এবং অধিকাংশ ক্ষুদ্র দল, জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে, এই আদর্শ মেনে নিয়েছিল। তবে সর্বদল তা করেনি। হিন্দু মহাসভা, জনসংঘ ও অধুনা বিজেপি একটি ভিন্নতর রাজনৈতিক আদর্শের অনুসারী। এই দলগুলি হিন্দু ভারতের আদর্শে বিশ্বাস করে, ও ভারতের সংস্কৃতিতে যে বহুমাত্রিকতা, সেটা অগ্রাহ্য করতে চায়।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রথম থেকেই মুসলিম লীগের প্রভাব অন্যসব দলের তুলনায় বেশী থাকায়, সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গা হয়নি। বরং দেশটিকে ইসলামিক রিপাবলিক

ঘোষণার মধ্য দিয়ে এই রাষ্ট্রে একটি ধর্মের ও একটি সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ অধিকারের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্মকে গুরুত্ব দেয়ার প্রশ্নে মুসলিম লীগের চেয়েও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে, জামাতে ইসলামী। জামাতে ইসলামী এক সময়ে পাকিস্তানের কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ভীষণ উত্তেজনা সৃষ্টি করে, ও একটি মারাত্মক দাঙ্গার সূচনা করে। লাহোরে সেই দাঙ্গায় বহু নিরীহ কাদিয়ানী নিহত হয়। দাঙ্গা দমন করার জন্য লাহোরে সামরিক আইন জারি করতে হয়েছিল। এবং জামাতের নেতা মাওলানা মওদুদী ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি ও দাঙ্গার আয়োজক হিসেবে মার্শাল ল' কোর্টে অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়। কিন্তু সেই দণ্ড কার্যকর করা হয়নি—তিনি প্রাণে রক্ষা পান।

জামাতে ইসলামী ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ,—তিনটি দেশেই রাজনৈতিক দল হিসেবে সক্রিয়। ভারতে তাদের লক্ষ্য—মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধকে জাগ্রত রাখা এবং যথাসম্ভব ভারতীয় রাজনীতির মূলধারা থেকে মুসলমানদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা। এর অতিরিক্ত কিছু করা বা চাওয়া হিন্দু প্রধান ভারতে জামাতের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু পাকিস্তানে তাদের লক্ষ্য দূরপ্রসারী, আর সেই লক্ষ্য অর্জনে তারা অনেকখানি সফল। পাকিস্তানে তারা শুধু যে ইসলামী প্রজাতন্ত্র গঠন করেছে তাই নয়, কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে তারা অমুসলিম বলে ইসলামের গণ্ডী থেকে বের করে দিয়েছে। বাংলাদেশেও জামাতে ইসলামীর লক্ষ্য এক। শাসকদলের সঙ্গে এক গভীর বোঝাপড়া আছে এই দলের। এই বোঝাপড়া ছাড়া তারা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব—খোয়ানো গোলাম আজমকে তাদের দলের আমীর নির্বাচন করার সাহস পেত না। নাগরিকত্বহীন গোলাম আজমকে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে দলের আমীরের পদ থেকে সরিয়ে দেয়নি ; বরং সংবিধান লংঘন করে তারা যা করছে, সেটাকে বৈধতা দেয়ার জন্য তারা আন্দোলন করে বলেছে।

ভারতের বিজেপি'রও লক্ষ্য একই। অর্থাৎ ভারত হবে হিন্দু রাষ্ট্র, অন্য ধর্মাবলম্বীরা থাকবে মাথা নীচু করে। ভারতের এতদিনকার ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি এরা বর্জন করতে চায়। এতদিন ভারতে, বিশেষত: ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকাল পর্যন্ত, এই রাজনীতি ও দেশের মূল ধারাকে তেমন স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু বিগত ৪/৫ বৎসর কালের মধ্যে, কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাটকীয়ভাবেই বিজেপি একেবারে সামনের সারিতে এসে গেছে। বিজেপি এখন কংগ্রেসের পরই, ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল।

এই ঘটনার মধ্যে বিস্ময় যাই থাক, এর আকস্মিকতা যতোই প্রশ্নবোধক হোক, এর বাস্তবতা আর অস্বীকার করার উপায় নেই। বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর ধর্ম-পরিচয়-চিহ্নিত রাজনৈতিক দলগুলি বেআইনী ঘোষিত হয়েছে ; কিন্তু বিজেপি হয়নি। কারণ বিজেপি নামের মধ্যে কোন সম্প্রদায়ের ছাপ নেই—যদিও বাস্তবে বিজেপি'র হাতেই ভারতের ধর্ম-

নিরপেক্ষতা সবচেয়ে বড়ো মার খেয়েছে। বিজেপি'র আনুকূল্য ছাড়া বিশ্ব হিন্দু পরিষদ রাষ্ট্রীয় স্বয়ং-সেবক সংঘের পক্ষে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের অভিযান সম্ভব হত না।

ভারতে ধর্মীয় রাজনীতির উত্থানের সঙ্গে পাকিস্তান-বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কোন প্রত্যক্ষ কার্যকারণ সম্বন্ধ স্পষ্ট নয়। কারণ ভারতের এই দুটি পার্শ্ববর্তী দেশ, পৃথিবীর অপরাপর মুসলিম দেশগুলির মতো, মৌলবাদী রাজনীতির একটা ধারা বরাবরই ছিল। পাকিস্তানে এই ধারাটি বেশ প্রবল ছিল। বাংলাদেশ মধ্য পঁচাত্তরের পর সামরিক ও আধা সামরিক শাসনামলে এই ধারাটিকে লালন করা হয়। সামরিক শাসকেরা নিজেরা ধর্ম বিষয়ে যাই ভাবুন না কেন, গণমানুষের গণতান্ত্রিক উদ্যমকে প্রতিহত করার জন্য ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে তারা ব্যবহার করতে সব সময় প্রস্তুত। শেষ পর্যন্ত স্বৈর শাসকদের সঙ্গে মৌলবাদীদের স্বার্থ অভিন্ন না হলেও সাময়িকভাবে এই দুই শক্তি এদের সাধারণ শত্রু গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে হাত মেলাতে পারে। বাংলাদেশে তাই দেখা যায়। বাংলাদেশে এরা এর সঙ্গে যুক্ত করেছে একটি জুজুর ভয়—এই জুজুটি হল ভারত। ভারত—বিভাগের পর থেকেই পাকিস্তানে, ও পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার পর, বাংলাদেশের নাটকীয় গতি পরিবর্তনের পর থেকেই, ভারতকে দেখা হয়েছে রূপকথার রাক্ষসের মতো। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বুনিয়াদ অনেকটাই এই কাল্পনিক ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে আবার এ দেশের ডানপন্থী রাজনীতি ও অতি বামপন্থী রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গি চমৎকারভাবে মিশে গেছে। এই পৌরাণিক রাক্ষসটিকে ইসলামী মৌলবাদীরা কতোটা ভয়ঙ্কর মনে করে বলা মুশকিল, কিন্তু বামপন্থীরা যে সত্যিই ভারতীয় আধিপত্যবাদের ভয়ে রাতের ঘুমকে হারাম করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারত অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু এই বিষয়টিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তার সঙ্গে ধর্মীয় উত্তেজনা যোগ করে, বাংলাদেশের যে পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছে তা সুস্থ গণতন্ত্র চর্চার জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে।

বাংলাদেশের ভাষা-আন্দোলনই প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ভিত্তি পত্তন করে। পরবর্তী সময়ের ইতিহাস এই আদর্শেরই বাস্তবায়নের ইতিহাস। সামরিক শাসনামলে শাসকেরা একমুখে বলেছেন, ধর্মের কথা, ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যকে আকাশে তুলেছেন আর সেই সঙ্গে শুনিয়েছেন ভারত-রাক্ষসের ভয়াবহ গল্প। এতে বাঙালীর রাজনৈতিক চেতনাকে আচ্ছন্ন করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি করায় গণতন্ত্রবিরোধী, মৌলবাদী শক্তিগুলি সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, কবে আবার পাকিস্তানী ধারায় ফিরিয়ে আনা যাবে দেশের রাজনীতিকে। সেই সুযোগ তারা পেলে মধ্য পঁচাত্তরে।

(অবশিষ্টাংশ ২৯ পৃঃ দেখুন)

কেন আহমদী হলেম

সয়ফরাজ এম, এ, সাত্তার রঞ্জু চৌধুরী

তখন আমি খৃষ্টান মতাদর্শে বিশ্বাসী। নেভাল অফিসে চাকুরী করি। আমার বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কেউ খৃষ্টান ছিলেন না, বা, নেই বরং আলেম ও হাফেয রয়েছেন। কিন্তু আমি কেন খৃষ্টান হতে গিয়েছিলাম এ বিষয়ে দু'একটি কথা না বললে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

এমন একদিন ছিল সেদিন বৃটিশ রাজত্বে সূর্য অস্ত যেতো না। গুরুত্বপূর্ণ বড় বড় রাজ পদে প্রায় সবাই ছিল ইংরেজ। একেতো জগদ্ব্যাপী তাদের প্রাধান্য। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, ধনে-সম্পদে, শক্তিসাহসে, শিক্ষা ও আদর্শে পৃথিবীতে গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত তারা। দ্বিতীয়তঃ তাদের কতকগুলি গুণ খৃষ্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে আমাকে। যেমন, কর্তব্য-নিষ্ঠা, ন্যায়নিষ্ঠা, সময়ের মূল্যবোধ, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি। আমি মনে মনে সর্বদা এই ধারণা পোষণ করতাম যে, আমিও ইংরেজদের মতই হব আদর্শবান। খৃষ্টধর্ম প্রধানতঃ তিনটি শাখায় বিভক্ত। সনাতন খৃষ্টধর্ম, ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যান্ট। এদের মধ্যে প্রটেষ্ট্যান্ট হচ্ছে সবচেয়ে নতুন শাখা। এদেরই প্রচেষ্টায় পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশ ঘটে। উদ্ভব হয় বর্তমান পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের। সে যা হউক। খৃষ্ট সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস এই যে, সকল যুগের সকল মহাপুরুষেরাই মরে গিয়েছেন, কেননা, তারা সকলেই ছিলেন মৃত্যুর অধীন। কেবল যীশুই (ঈসা আঃ) ছিলেন একমাত্র মৃত্যুর উপর বিজয়ী। তিনি ঈশ্বরের জাত পুত্র। নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ হেতু বাবা আদম পাপী ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে আদম সন্তানগণ সকলেই পাপী। ঈশ্বর তার একমাত্র জাতপুত্র যীশুকে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন, ক্রুশে রক্ত দানে ঈশ্বর পুত্র যীশু (ঈসা আঃ) আদি পাপের প্রায়শ্চিত্য করতঃ স্বর্গে নীত হয়ে ঈশ্বরের ডান পাশে বসে আছেন। যেরূপভাবে মেঘরথে আরোহণ পূর্বক তিনি স্বর্গে গিয়েছিলেন, তদরূপভাবেই মেঘরথে আরোহণপূর্বক পুনরায় তিনি পৃথিবীতে নেমে এসে প্রেম দ্বারা জগতে স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। পাদ্রীগণের দাবী এই ছিল যে, যীশু (ঈসা আঃ) খোদার পুত্র সত্যি। যে কারণে খোদাতা'লা যীশুর (ঈসা আঃ এর) অনুসারী খৃষ্টান জাতিকে বিশেষ অধিকারীরূপে বিজয় দান করতঃ জ্ঞানে বিজ্ঞানে, ধনে সম্পদে, মানে সম্মানে, শক্তি সামর্থ্যে বিশ্বের বুকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

মুসলমান আলেম ওলামাগণের দাবী এই যে, ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, মুসলমানগণ সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সর্ব শেষ নবী তাঁর পরে আর কোন নবী নাই। তিনি

মরে গিয়ে মদীনার মাটির নীচে শুয়ে আছেন, কিন্তু খৃষ্টানদের নবী ঈসা (আঃ) মরেন নাই। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে সশরীরে চতুর্থ আসমানে তুলে নিয়েছেন। অদ্যাবধি তিনি চতুর্থ আসমানেই অবস্থান করছেন। শেষ যুগে তিনি দুই ফিরিশ্‌তার কাঁধে ভর করে চতুর্থ আসমান থেকে পৃথিবীতে নেমে এসে তলোয়ারের যুদ্ধে কাফেরদের বধ করতঃ মুসলমান জাতিকে উদ্ধার করবেন। এখান থেকেই শুরু হলো আমার অন্তর্দ্বন্দ্ব। কেননা বিশ্বাসের দিক দিয়ে খৃষ্টান এবং মুসলমানগণ একই পথের যাত্রী। আমার মধ্যে যে সুমতি ও কুমতি আছে তাদের মাঝে শুরু হলো লড়াই। আমি কার উপর বিশ্বাস রাখি, জীবন্ত খোদার জীবন্ত পুত্র যীশুর (ঈসা আঃ এর) প্রতি অথবা মৃত আবদুল্লার মৃত পুত্র মোহাম্মদের প্রতি? বড় নবী কে, খৃষ্টানদের নবী যীশু (ইসা আঃ) অথবা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)? খোদাতা'লা কার প্রতি বেশী প্রেম ও ভালবাসা রাখেন, ঈসা (আঃ)-এর প্রতি, অথবা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি? হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যদি বড় নবী হয়ে থাকেন, তবে তিনি মরে গিয়ে মদীনার মাটির নীচে শুয়ে আছেন, আর খৃষ্টানদের নবী ঈসা (আঃ) কিনা অদ্যাবধি চতুর্থ আসমানে সশরীরে অবস্থান করছেন এবং দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করতঃ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এরই উম্মতগণকে উদ্ধার করবেন। আর তারই অপেক্ষায় আসমানের দিকে চেয়ে আছে কিনা মুসলমান জাতি। আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছা যদি এরূপই হয়ে থাকে তবে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কখনও বড় নবী নহেন। কেননা আল্লাহতা'লা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর চাইতে ঈসা (আঃ)-কে অজেয় শক্তি প্রদান করেছেন। মুসলমান আলেম ওলামাদের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে খৃষ্টানদের কথাই বা সত্যি হবে না কেন? হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন খৃষ্টান জাতির নবী। দ্বিতীয় বার যখন তিনি পৃথিবীতে আগমন করবেন, তখন তিনি কোন্ পক্ষ অবলম্বন করবেন, খৃষ্টান অথবা মুসলমান পক্ষ? তিনি স্বয়ং যে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সেই ধর্মের অনুসারী খৃষ্টান পক্ষ ব্যতীত অন্য কোন পক্ষ অবলম্বন করতে পারেন না। হয়তো বা সমগ্র পৃথিবীটাকেই তিনি খৃষ্টান বানিয়ে ফেলবেন। বর্তমান যুগে খৃষ্টান ধর্মের প্রচার কার্যদ্বারা এ কথাই প্রমাণ হয়। এই কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যখন তারা বলে যে যীশু (ঈসা আঃ) দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করতঃ প্রেম দ্বারা জগতকে জয় করবেন এবং শান্তি সুখের স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু ইসলামের আলেম ওলামাগণ বলেন, ঈসা (আঃ) চতুর্থ আসমান থেকে নেমে এসে অমনি তলোয়ার দ্বারা কাফেরগণকে বধ করার কাজে লেগে যাবেন আলেম ওলামাগণের এই কথাটা বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে বড়ই খটকার বিষয়। একজন মহাপুরুষ এসে অমনি তলোয়ার দ্বারা কাফেরগণকে হত্যার কাজে লেগে যাবেন। আর বর্তমান এ্যাটোম বোমা ন্যাপাম বোমা ইত্যাদির যুগে কাফেরেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিবে একথা কখনও যুক্তি সঙ্গত সত্য বলে বিশ্বাস হবে না। তারপর দাজ্জাল

ও ইয়াজুজ এবং মা'জুজ সম্পর্কে তারা যে সকল কেচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করেন, এগুলি আমার কাছে আরব্য উপন্যাসের দৈত্য দানবের ন্যায় কল্প-কাহিনী বলেই ধারণা হতো। সুতরাং আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে ছিল যে, খৃষ্টানগণ যা বলেন অর্থাৎ যীশু (ঈসা আঃ) দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করতঃ প্রেম দ্বারা সমগ্র জগতকে জয় করবেন এবং শান্তির স্বর্গরাজ্য কায়েম করবেন একথাই সত্যি! অতএব যীশু (ঈসা আঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তারপর মুসলমান জাতির দিকে একটু ভাল নজরে তাকালে মনে হতো না যে, এরা শ্রেষ্ঠ ধর্মের অনুসারী এবং শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত। কেননা বাস্তবে কাজে কর্মে শ্রেষ্ঠত্বের কোন নজির তাদের মধ্যে পাওয়া যেত না। শিক্ষা সভ্যতায় আচার আচরণে ব্যবহারিক জীবনে শ্রেষ্ঠত্বের কোন আদর্শ তাদের মধ্যে নেই। সকল দিক দিয়ে সকল জাতির কাছে তারা অবহেলিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, সভ্যি দেশ বলতে বুঝি ইউরোপ, আমেরিকা, সভ্য জাতি বলতে বুঝি ইউরোপ, আমেরিকার খৃষ্টান জাতিকে। কই, মুসলমান এবং তার মক্কা মদীনার পাশ দিয়েও তো ঘেঁষে না কেউ। এমতবস্থায় তাদের ধর্ম এবং তাদের নবীই বা শ্রেষ্ঠ হবে না কেন? যে ধর্ম বা যে নবীকে অনুসরণ করে শ্রেষ্ঠত্বের নজির পেশ করা যায় না, যে ধর্ম বা যে নবীকে অনুসরণ করে জগতের বুকে আদর্শ শিক্ষক হওয়া যায় না, সে ধর্ম বা সে নবী শ্রেষ্ঠ হলো কেমন করে? জ্ঞানে বিজ্ঞানে, ধনে সম্পদে, শক্তি সামর্থ্যে, শিক্ষা সভ্যতায় খৃষ্টান জাতি বিশ্বের বুকে প্রভুত্বের আসনে অধিষ্ঠিত। সুতরাং এরাই শ্রেষ্ঠ ধর্মের বা শ্রেষ্ঠ নবীর অনুসারী। এ বিশ্বাসই আমার অন্তরে জন্মেছিল। আবার জাতি হিসাবে তুলনা করলেও মনে হতো না যে, মুসলমান জাতি কখনও শ্রেষ্ঠ হতে পারে। পৃথিবীতে ন্যায়-বিচার যারা প্রতিষ্ঠা করে তারাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। ইংরেজগণ এত বিশাল এবং এত বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রের অধিকারী হয়েও এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তারা কখনও কারো উপাসনালয় মসজিদ কিংবা মন্দির ভেংগেছে বা কারো ধর্ম বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করেছে। প্রচার শক্তিই হলো ধর্মের প্রাণ। যে ধর্মের প্রচার কার্য নেই, সে ধর্ম প্রাণহীন দেহের তুল্য। মুসলমান জাতির ধর্ম ইসলামের কোন সংগঠন নেই, নেই কোন প্রচার কার্য নেই। এথেকে আমার ধারণা হতো যে, এ ধর্মের কোন সারবস্তুই নেই। খৃষ্টানগণ বিশ্বের বিভিন্ন শহর বন্দরে ঘাটে গঞ্জে এমন কি পল্লীর নিভৃত কোণে তাদের ধর্ম প্রচার মিশন প্রতিষ্ঠা করতঃ তাদের ধর্মকে জীবন্ত রেখেছে। মানুষের সেবায় স্কুল হাসপাতাল ইত্যাদি কায়েম করেছে। কিন্তু মুসলমানগণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে মরে গিয়ে কবে নাগাত বেহেশ্‌তে যাবে। খৃষ্ট ধর্মের একটি সংগঠন আছে, তাদের একজন পোপ বা নেতা আছে যার অধীনে সংঘবদ্ধভাবে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে একতা ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে একজন নেতার আদেশ উপদেশকে মান্য করে ধর্মের প্রচার এবং প্রসারের কাজে নিমগ্ন। এমন বহু আত্মউৎসর্গ-

কারী লোক আছে যারা মানুষের সেবায় ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। আহমদী ভাই বোনেরা ক্যাপ্টেন ডগলাসের ন্যায়পরায়ণতার কথা অবশ্যই জানেন। তাদের এই গুণ অন্য কোন জাতির সাথে তুলনা করা যায় না। রাজনৈতিকভাবে যদিও তারা যুলুম অত্যাচার করেছে তথাপি তাদের হৃদয়ে ন্যায়ের আসন যেমন পূর্বেও ছিল এখনও আছে। শুনেছি খৃষ্টানদের দেশে কারো কোন জিনিস হারিয়ে গেলে পাওয়া যায় কিন্তু মুসলমান দেশে? বৃক্ষের পরিচয় হয় ফল দ্বারা। সুতরাং এই জাতিই আমার হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে গেঁড়ে বসেছিল। আমার ব্যক্তিগত জীবনে এর নজির রয়েছে যা কখনও ভুলে যাওয়ার বিষয় নয় বা ভুলা যায় না। মুসলমান জাতির কোন নেতা নেই। নেই কোন শৃঙ্খলা। মুসলমান জাতির ভ্রাতৃত্বের কান্না পুঁথি পুস্তকে শুনেছি কিন্তু বাস্তবে দেখি তার উল্টা। শীয়া, সুন্নী, ওয়াহাবী, নকশেবন্দীয়া, চিশতীয়া, দেওবন্দী, বেরেলবী ইত্যাদি বহুধা বিভক্ত হয়ে এক দল আরেক দলের উপর কুফরীর তীক্ষ্ণ তলোয়ার হস্তে কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয় ইত্যাদি কাঁটা ছাঁটের কাজে ব্যস্ত। শীয়াগণ বলে সুন্নীগণ কাফের, সুন্নীগণ বলে শীয়াগণ কাফের, বেরেলবীগণ বলে দেওবন্দীগণ কাফের, দেওবন্দীগণ বলে বেরেলবীগণ কাফের। সুতরাং অকাফের আর থাকলো না কেউ। এই সমস্ত লক্ষ্য করে আমার মনে আরেকটা প্রশ্নের উদয় হতো যে, হযরত ঈসা (আঃ) যখন চতুর্থ আসমান থেকে নেমে এসে তলোয়ার দ্বারা কাফেরগণকে হত্যা করার কাজে লেগে যাবেন, তখন তিনি কাদের পক্ষ অবলম্বন করবেন, সুন্নীদের পক্ষ, কিনা শিয়াদের পক্ষ, কিংবা অন্য কোন দলের?

(ক্রমশঃ)

সন্তান লাভ

আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর বিশেষ ফযলে গত ৫ই মার্চ, ১৯৯৩ ইং (১০ই রমযান) রোজ শুক্রবার বেলা ১'৩০ মিনিটে ঢাকাস্থ ক্লিনিকে আমাকে একটি পুত্র সন্তান দান করিয়াছেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌তা'লা যেন এই নবজাত সন্তানকে দীর্ঘায়ু দান করেন এবং সিলসিলা আলীয়া আহমদীয়ার একজন উচ্চ মোকামের খাদেম করেন সেই জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট বিশেষ দোয়ার আবেদন জানাইতেছি।

মোহাম্মদ আফজাল হোসেন ভূঞা
মোহতামীম তাহরীক-ই-জাদীদ
বা, ম, খো, আ।

সংবাদ

বিশ্ব-খলীফার ঈদের বাণী

সমগ্র বিশ্বের ১৩০টি দেশের আহমদীয়া মুসলিম জামাতসমূহের উদ্দেশ্যে জামাতে আহমদীয়ার ইমাম ও চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর বাণী ঃ

প্রিয় ভ্রাতা, ভগ্নী ও শিশুরা আমার,
আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্‌।

জাগতিক আধ্যাত্মিক উভয় দিক দিয়ে এ ঈদ আমাদের সকলের জন্যে আল্লাহ্‌তালা পরিপূর্ণভাবে কল্যাণমণ্ডিত করুন। প্রকৃতপক্ষে কুরবানীর স্বীকৃতির নিদর্শন স্বরূপ রমযানের পর আসে ঈদ। আল্লাহ্‌তা'লার পরম অনুগ্রহে আমরা সকলে এ আশীর্বপূর্ণ ঈদে সমবেত হচ্ছি। আমি দোয়া করি যে. আমাদের ঈদ আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে গৃহীত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করুক আর এর সুখ ও আনন্দ কেবল আজকের দিনটিতেই যেন সীমাবদ্ধ না থাকে বরং পরবর্তী রমযান পর্যন্ত যেন এই রমযানের আশীষ প্রবহমান থাকে।

রমযানের বহু কল্যাণের মধ্যে যা আমরা পেয়েছি, তাহলো এই যে, আমাদের ক্ষুধা ও-পিপাসার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অনেকাংশে আমাদের গরীব ভাইদের দারিদ্র ও দুঃখ-দুর্দশা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই। সুতরাং এ ঈদের প্রেক্ষাপটে আপনাদের গরীব ও সর্বহারা ভাইদের আনন্দের সাথে শরীক হওয়ার জন্যে বিশেষভাবে প্রচেষ্টা চালাবেন। এক্ষেত্রে সবচে' বেশী হক্‌দার হলেন আমাদের মুসলিম ভাই, বোন ও শিশুরা, বিশেষ করে ঐ সব বসনিয়ার মোহাজেরবৃন্দ যারা, তাদের যা ছিল সব হারিয়ে এবং অত্যাচারের নির্মম পেষণে জর্জরিত হয়ে পাশ্চাত্য জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের সার্বিক দুঃখ-দুর্দশায় শরীক হওয়া আমাদের সাধ্যের বাইরে। তবু আমাদের আন্তরিক ও গভীর অনুভূতি এবং তাদের জন্যে দোয়া দ্বারা তাদের চরম মানসিক অশান্তি লাঘব করার চেষ্টা করে যদি আমরা তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে পারি তাহলে ইহাই হবে উত্তম উপায়। বস্তুতঃ দোয়াকে উন্নীত ও গৃহীত করতে হলে অনুভূতির আন্তরিকতা আমাদের কাজের মধ্যে প্রতিফলিত করা জরুরী।

যে সব দেশে এ সম্মানিত ভাইয়েরা নির্বাসিত হননি, জামাতগুলো বিশেষ আর্থিক সাহায্য দ্বারা তাদের আন্তরিক অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে পাকিস্তানী জামাত সাহায্যদাতাদের শীর্ষ তালিকায়। অনুরূপভাবে বাংলাদেশ, ভারত এবং অন্যান্য এশিয়ান দেশগুলোর আহমদীগণ তাদের আন্তরিক অনুভূতির প্রিয় নিদর্শনসমূহ পেশ করেছেন।

প্রাশ্চাত্য দেশে যে সব আহমদী বসবাস করেন কেবল আর্থিক সাহায্যই তারা দেননি বরং তাদের (বসনিয়দের) প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করতে তারা সক্রিয় রয়েছেন। সব জায়গাতেই তারা পারিবারিক বা জামাতী পর্যায়ে ঈদ উৎসবে যোগদানের জন্যে

তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। যেখানে এই বাণী পৌঁছে গেছে তাদের উচিত তারা যেন তাদেরকে (বসনিয়দের) ঈদ অনুষ্ঠানে যোগদান করতে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের প্রতি বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি জানান। আর তাদেরকে এ নিশ্চয়তা বিধান করেন যে, যদিও আমাদের মানবিক সাহায্য উল্লেখযোগ্য নয়, তথাপি আমাদের আন্তরিক দোয়া নিশ্চয় আল্লাহ্‌তা'লার করুণাকে আকর্ষণ করবে এবং তিনি তাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচন করবেন। আর জাতি হিসেবে তারা এক নব-জীবন লাভে সমর্থ হবে।

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের আন্তরিক আকুতি কবুল করুন।

মহান সিরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা উদ্‌যাপনঃ -

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌, সুন্দরবন,

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযল ও বরকতে সুন্দরবন লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে গত ১০-৩-৯৩ ইং রোজ বুধবার সকাল ১০-৩০ মিনিটে দারুত তবলীগস্থ মসজিদে মহান সিরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা উৎযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে ৮২ জন লাজনা এবং ২৫জন নাসেরাত উপস্থিত থাকেন। লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ সুন্দরবনের ভাইস প্রেসিডেন্ট এর সভানেত্রীত্বে উক্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং বেলা ১'০০ ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠান স্থায়ী হয়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট, মোয়াল্লেম এবং সদর মুরব্বী মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব উপস্থিত থাকেন, এবং মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন।

বেগম হোসনেয়ারা ইউনুস
জেনারেল সেক্রেটারী
লাজনা ইমাইল্লাহ্‌, সুন্দরবন।

সুন্দরবন জামাত

গত ৩-৪-৯৩ রোজ শনিবার সুন্দরবন আহমদীয় মুসলিম জামাতের পক্ষ হতে বড়ভেট খালি হালকার এক মনোরমপূর্ণ সিরাতুন্নবী (সাঃ) জলসার আয়োজন করা হয়। বিকাল ৫-৪৫ ঘটিকায় শুরু হয়ে রাত ৯-৩০ মিঃ পর্যন্ত জলসার কাজ চলে। জলসায় সভাপতিত্ব করেন জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শেখ সফরুদ্দিন সাহেব। মহানবী হুযুর (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন, সর্ব জনাব এস, এম, রেজাউল করিম, জি, এম, আবু মোসলেম, এস, কে, আলমগীর হোসেন, আঃ সাদেক, খাকসার ও জি এম, মতিয়ার রহমান। এলাকার আহমদী ছাড়াও গয়ের আহমদী (হিন্দু-মুসলিম) বন্ধুগণও জলসায় শরীক হন।

মোহাম্মদ মজিবুল ইসলাম
মোয়াল্লেম।

সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২-৪-৯৩ ও ৩-৪-৯৩ তারিখে যথাক্রমে আহমদীয়া মুসলিম জামাত খাগদন ও কুকুয়াতে সফলতার সাথে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় বক্তাগণ ছাড়াও কেন্দ্রের প্রতিনিধিগণ ইসলামের বিভিন্ন দিকের উপর আলোচনা করেন। উভয় জলসায় বেশ কিছু সংখ্যক অ-আহমদী হিন্দু-মুসলমান ভাইও যোগদান করেন।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, ৩-৪-৯৩ তারিখ খাগদন জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়ীতে একটি ঘরোয়া জলসার আয়োজন করা হয়। এতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে প্রশ্ন উত্তর আলোচনাও হয়। আহমদী বার্তা।

ওয়াকারে আমল কর্মসূচী বাস্তবায়ন

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযল ও রহমতে গত ৯-৩-৯৩ রোজ সোমবার সুন্দরবন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার পক্ষ হতে ওয়াকারে আমল কর্মসূচী পালন করা হয়। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ১৮ জন খাদেম ৭ জন আতফাল, ২ জন আনসার এবং ২ জন গয়ের আহমদীর দীর্ঘ ৩ ঘন্টা স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে এলাকার বহুল প্রসিদ্ধ একমাত্র পানি শোধনাগার কেন্দ্রটি পরিষ্কার করে। উক্ত কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী সকলকে আল্লাহ্‌তা'লা উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন। আমীন। মি, এম, মোবারক আহমদ, কায়েদ

পিতামাতা দিবস পালিত

গত ১২-৩-৯৩ তারিখে বাদ জুমুআ চান্দপুর চা বাগান মঃ খোঃ আহমদীয়ার উদ্যোগে বার্ষিক মাতাপিতা দিবস পালন করা হয়। পিতামাতা দিবসের আলোকে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোস্তাক আহমদ, জলিল আহমদ হুমায়ুন কবির (মোয়াল্লেম), আনোয়ার হোসেন। সবশেষে সভাপতির ভাষণ দেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। এতে হবিগঞ্জ থেকে আগত লাজনা ও ছোট আতফাল অংশ গ্রহণ করেন। পর্দার আড়ালে স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ ও নাসেরাতও ছিলেন। মোট উপস্থিত ছিলেন ২২ জন। মোঃ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, কায়েদ

শুভ বিবাহ

তারুয়া নিবাসী মরহুম ইসমাঈল আহমদ-এর পুত্র মোসাদ্দেক আহমদ গত ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ তারিখে ৫০,০০১/- (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মাত্র দেন মোহর ধার্যে আহমদনগর (শাল সিঁড়ি) নিবাসী মরহুম শামসুজ্জামান-এর কন্যা তাহমীনা সুলতানা (হীরা)-এর সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। এ বিয়ে পড়ান মাওলানা সালেহ আহমদ।

এ বিয়ে সামগ্রিকভাবে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্যে সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে। মোবাশ্বের আহমদ, তারুয়া

শোক সংবাদ

এডিশনাল আমীর আবদুল বারীর আকস্মিক মৃত্যু

আমরা গভীর দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ও আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের এডিশনাল আমীর জনাব আবদুল বারী গত ৮ই মার্চ '৯৩ বৃহস্পতিবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আকস্মিকভাবে পরলোক গমন করেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন) অবসর গ্রহণের আগে তিনি নেপাল, ইরাক ও লিবিয়ায় রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তার পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বিশিষ্ট আইনজীবী মরহুম গোলাম সামদানী খাদেম। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬২ বৎসর। জীবনে তিনি ছিলেন, সহজ, সরল, স্বল্পভাষী ও একান্ত অনাড়ম্বর। তিনি এক শীতবান ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বহু গুণগ্রাহী, বন্ধু-বান্ধব, তিন পুত্র ও

স্ত্রীকে রেখে তিনি জান্নাতবাসী হন। সকাল সাড়ে দশটায় মরহুমের বাসায় একবার জানাযার নামায হয় এতে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব এস. এম. মোস্তাফিযুর রহমান এবং বহু সরকারী ও বেসরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। পরে ৪নং বকশী বাজার আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গণেও তার জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। বনানী গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা। গোরস্থানেও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

শোক প্রস্তাব

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের এডিশনাল ন্যাশনাল আমীর মোহতরম আবদুল বারী সাহেবের আকস্মিক মৃত্যুতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের মজলিসে আমেলা এর ২-৪-৯৩ তারিখের সভায় নিম্নোক্ত শোক প্রস্তাব গ্রহণ করে:

"খড়মপুরের বিখ্যাত খাদেম পরিবারের ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বিশিষ্ট এডভোকেট মরহুম গোলাম সামদানী খাদেম সাহেবের সুযোগ্য পুত্র মোহতরম জনাব আবদুল বারী, বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত, একজন মোখলেস আহমদী ছিলেন। সদালাপী ও বন্ধুবৎসল ছিলেন তিনি। তাঁর বুযুর্গ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি নিষ্ঠার সাথে সেলসেলার খেদমত করেছেন। স্বল্পভাষী, গাম্ভীর্যপূর্ণ এ মহান ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া যারাই পেয়েছেন অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছেন। সরকারের অতি উচ্চ পদে সমাসীন থাকা সত্ত্বেও তিনি সাদাসিদা জীবন যাপন করতেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মজলিসে আমেলা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করছে। আল্লাহ্-তা'লা মরহুমকে জান্নাতের উচ্চ মোকামে স্থান দিন এবং তাঁর পরিবারের সকলকে দিন সাব্‌রে জামীল'।

মরহুমের মৃত্যুতে বিভিন্ন জামা'ত থেকেও শোক বার্তা পাওয়া গেছে এদের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা ও রাজশাহী জামা'তের নাম উল্লেখযোগ্য। আহ্‌মদী বার্তা

আমার পিতা মরহুম মোহাম্মদ হাসান আলী দেওয়ান নিজ বাসস্থান পাঃ মুঃ জাঃ পুরুলিয়াতে গত ১৪-৩-৯৩ তারিখে বেলা ১-৩০ মিঃ সময় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন) মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৮৫ বৎসর। মৃত্যুকালে মরহুম দুই ছেলে এক মেয়ে নাতী-নাতনীসহ অনেক আত্মীয় স্বজন রেখে যান। মরহুম ১৯৮৩ সনে পরিবারের সবাইকে নিয়ে আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হন। প্রকাশ থাকে যে, তাঁর ছেলে থাকসার ওয়াকেফে জিন্দেগী মোয়াল্লেম। তিনি অস্থায়ী প্রেসিডেন্টও ছিলেন। আল্লাহ্‌তা'লা যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মোকাম দান করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকলকে সাব্‌রে জামিল দান করেন। আমীন। মোঃ শামসুল ইসলাম
মোয়াল্লেম

বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছাবাণী

বাংলা চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ বর্ষের শুভ সূচনা লগ্নে আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

পাক্ষিক আহমদী ব্যবস্থাপনা

সম্পাদকীয় ঃ

বসনিয়া ফাণ্ড

সমগ্র দুনিয়ায় আজ মুসলমানরা অস্ত্র দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে। বসনিয়া, আফগানীস্তান, লেবানন, ফেলিস্তিন, আজারবাইজান, ইরাক, ভারত, সোমালীয়া প্রভৃতি দেশে মুসলমানদের রক্ত ঝরছে। মৌলবাদী মুসলমানরা কথায় কথায় জেহাদ ঘোষণা করে কিন্তু বসনিয়ার বেলায় তারা একবারও জেহাদের কথা বলল না। তারা জেহাদ করে কলেমা পাঠকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানে, মিশরে, আলজিরিয়ায়, সুদানে মৌলবাদীরা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ে চলেছে। জেহাদ আজ মুসলমানে মুসলমানে। বসনিয়ায় মুসলমানকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। প্রায় পঞ্চাশ হাজার মুসলিম মহিলাকে খৃষ্টানরা ধর্ষণ করেছে। হাজার হাজার মহিলা গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। ক্যাথলিক ধর্মের প্রধান গুরু পোপ ঐ সব গর্ভবতী মুসলিম নারীদেরকে গর্ভপাত না ঘটাতে উপদেশ দিয়েছেন (ভোরের কাগজ ৬/১১/৯৯)। কিন্তু তিনি তার শিষ্য খৃষ্টান সার্বদেরকে এহেন কর্ম থেকে বিরত থাকতে কোন নসিহত খয়রাত করেন নি। অপর দিকে ইতালীর একজন ধর্মযাজক খৃষ্টান মেয়েদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন যাতে তারা কোন মুসলমানকে বিয়ে না করে (ঐ)। অথচ ঐ সব ধর্মযাজকদের কর্মকাণ্ড আজ কাল প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পেয়ে থাকে। জনৈক আর্চবিশপ পাঁচজন মহিলার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অপরাধে সম্প্রতি কর্মচ্যুত হয়েছেন (ভোরের কাগজ, ৭/১২/৯৯)। সার্বীয় নেতারা মুসলমান মহিলাদের গর্ভে তাদের সৈন্যদের সন্তান উৎপাদনের জন্য প্রকাশ্যে উৎসাহিত করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুসলমানদের 'দরদে' মুসলমান রাজ্য ইরাকে দৌড়ে আসেন কাল বিলম্ব না করে। কিন্তু বসনিয়ার মুসলিম নিধন বন্ধ করার ব্যাপারে তারা নীরব।

আহমদীয়া মুসলিম জমাতের বিশ্ব নেতা খলীফা সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন বসনিয়ার মুসলমানদের জন্য। সমগ্র বিশ্বের আহমদীয়া জামাতগুলি তাদের প্রাণ প্রিয় খলীফার আহ্বানে সারা দিয়ে কোটি কোটি টাকা চাঁদা দিয়েছে বসনিয়া ফাণ্ডে। খলীফাতুল মসীহ (আইঃ) বলেছেন, বসনিয়ার দুঃখী মুসলমানদেরকে ঈদে শামিল করে নিতে। তাদেরকে বাদ দিয়ে প্রকৃত ঈদ হতে পারে না। আহমদীরা এবার ঈদের খরচ কমিয়ে বসনিয়া ফাণ্ডে অর্থদান করেছে। আমাদের উচিত এই ফাণ্ডে মুক্ত হস্তে চাঁদা দেওয়া।

নির্বাহী সম্পাদক।

15ht April, 1993

আহ্‌মদী

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury